গবেষণাপত্র সংকলন-১৭

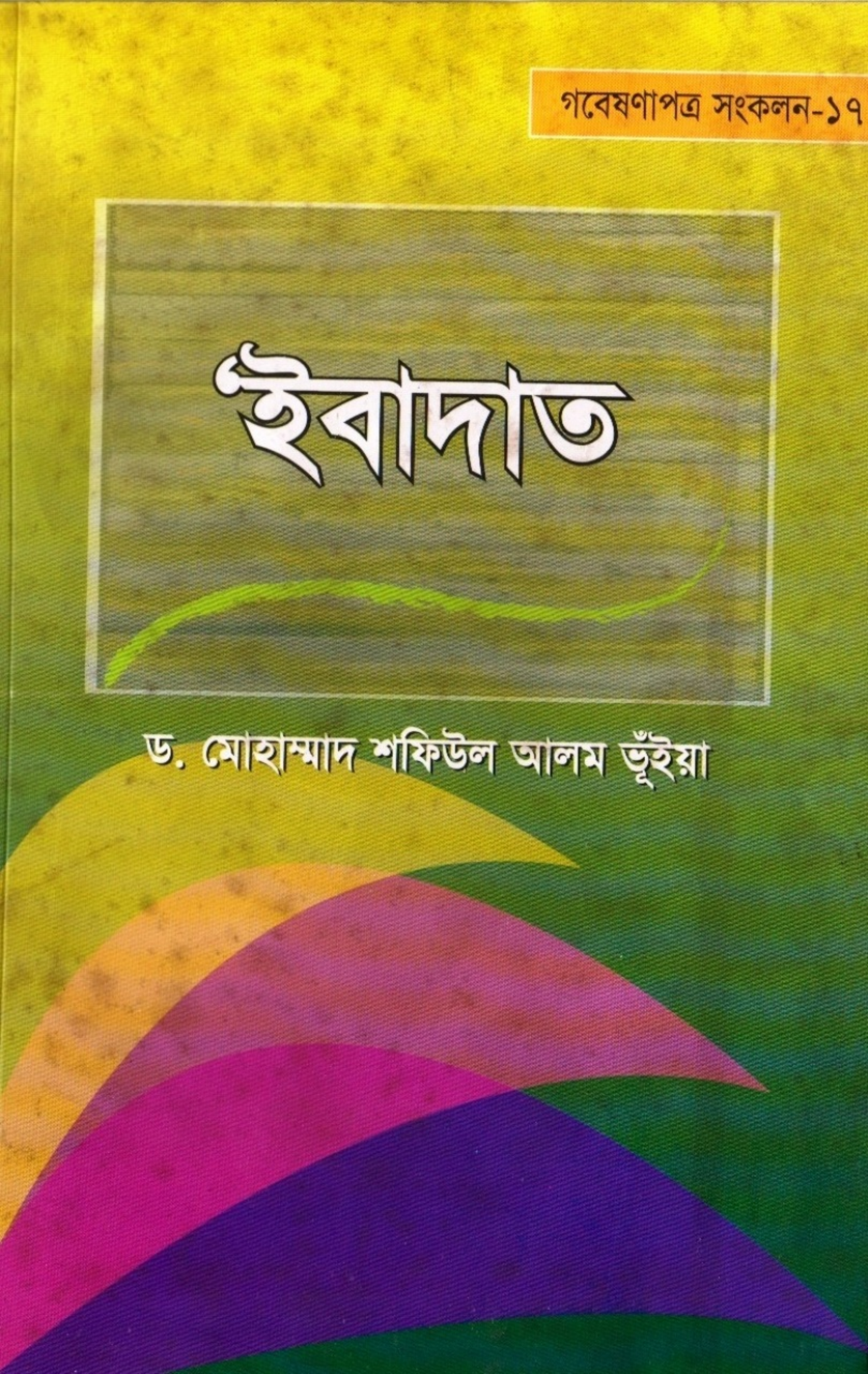

ইবাদাত

ড. মোহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

গবেষণাপত্র সংকলন-১৭

‘ইবাদাত

ড. মোহাম্মাদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ৯৬৬০৬৪৭
সেলস এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব		বিআইসি কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল		মার্চ, ২০১১ ফাল্গুন, ১৪১৭ রবিউস সানি, ১৪৩২
ISBN		984-843-029-0 set
প্রচ্ছদ		গোলাম মাওলা
মুদ্রণ		আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস মগবাজার, ঢাকা।
মূল্য	:	**পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র**

Gobesonapatra Sankalan-17 Written by Dr. Muhammad Shafiul Alam Bhuiyan and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition March-2011 Price Taka 65.00 only.

প্রারম্ভিক কথা

সাতাশে মে, ২০১০ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত একটি স্টাডি সেশনে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া "ইবাদাত" শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন : ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ এবং জনাব মুহাম্মাদ শাফী উদ্দীন।

সম্মানিত গবেষক বিজ্ঞ আলোচকদের পরামর্শের ভিত্তিতে গবেষণাপত্রটিকে আরো সমৃদ্ধ করে বর্তমান রূপ দান করেন।

ইবাদাত মুমিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতএব ইবাদাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ প্রত্যেক মুমিনেরই একান্ত প্রয়োজন।

আমরা আশা করি, এই গবেষণাপত্রটি ইবাদাত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রাখবে। আমরা আরো আশা করি, গবেষণাপত্রটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

'ইবাদাতের পরিচয় ॥ ৯
মা'বুদ, 'ইবাদাত ও 'আব্দ ॥ ১১
'ইবাদাত ও ঈমান ॥ ১২
ঈমান হলো 'ইবাদাতের প্রবেশদ্বার ॥ ১৪
'ইবাদাতের পরিশুদ্ধতা ঈমানের পরিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল ॥ ১৫
'শাহাদাতান' বা সাক্ষ্যদ্বয়ের সাথে 'ইবাদাতের সম্পর্ক ॥ ১৭
প্রথম সাক্ষ্য ॥ ১৮
দ্বিতীয় সাক্ষ্য ॥ ১৮
সাক্ষ্যদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ॥ ১৯
'ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ ॥ ১৯
প্রথম শর্ত: আল-ইখলাস ॥ ২০
দ্বিতীয় শর্ত: আল-মুতাবা'আ ॥ ২১
'ইবাদাতের সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মনীষীর উক্তি ॥ ২২
❖ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া প্রদত্ত সংজ্ঞা ॥ ২২
❖ ইমাম কুরতুবীর সংজ্ঞা ॥ ২৩
❖ 'আল্লামা ইবন কাসীরের সংজ্ঞা ॥ ২৩
❖ ইমাম রাযীর সংজ্ঞা ॥ ২৩
❖ 'আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদীর সংজ্ঞা ॥ ২৪
❖ ড: ইউসুফ আল-কারাদাবীর ব্যাখ্যা ॥ ২৪
'ইবাদাত হলো বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার ॥ ২৫
'ইবাদাতের ব্যাপারে সকলেই আদিষ্ট ॥ ২৯
'ইবাদাত হলো ইসলামের প্রাণ॥ ৩১
'ইবাদাত শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য ॥ ৩৪
হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল 'ইবাদ ॥ ৩৭
'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা আরোপ করা অবৈধ ॥ ৪২
মধ্যস্থতা বা 'ওসীলা'র অর্থ ও এর তাৎপর্য ॥ ৪৭
আল-কোরআনে বর্ণিত 'ওসীলা' অন্বেষণের প্রকৃত মর্ম ॥ ৪৯

মহান আল্লাহই হলেন একমাত্র ত্রাণকর্তা ॥ ৫৫
মানুষেরা একে অন্যের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না ॥ ৫৮
নবী কিংবা সাহাবীগণের ওসীলায় দু‘আ করার প্রকৃত মর্ম ॥ ৬০
ওসীলার প্রচলিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে ব্যক্তিপূজার দ্বার উম্মোচিত হয় ॥ ৬২
‘ইবাদাত হলো ইসলামের প্রথম নির্দেশ ॥ ৬৫
‘ইবাদাতের আরেক কোরআনী পরিভাষা হলো ‘আমলে সালেহ’ ॥ ৬৬
‘ইবাদাত হলো সকল নবী-রাসূলের প্রথম আহ্বান ॥ ৬৮
‘ইবাদাত হলো নির্ভেজাল ভালবাসা ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের সমন্বিত রূপ ॥ ৭০
‘ইবাদাত বিশেষ কোন কর্মের নাম নয় ॥ ৭৪
মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাও ‘ইবাদাত ॥ ৭৫
‘ইবাদাতের প্রকারভেদ ॥ ৮০
‘ইবাদাত ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন ॥ ৮৪
‘ইবাদাত হলো মানব জীবনের এক সাবলীল প্রক্রিয়া ॥ ৮৯
ইসলামে ‘ইবাদাতের পরিধি ॥ ৯১
জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডও ‘ইবাদাত ॥ ৯৩
পেশাগত এসব কাজ ‘ইবাদাত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত: ॥ ৯৬
এক: কাজটি ইসলামী শারী‘য়াতের দৃষ্টিতে বৈধ হওয়া চাই ॥ ৯৬
দুই : কাজটি বিশুদ্ধ নিয়াতে হওয়া চাই ॥ ১০০
তিন: কাজটি একাগ্রতা ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করা চাই ॥ ১০১
চার: কাজটি করতে গিয়ে শারী‘য়াতের সীমারেখা মেনে চলতে হবে ॥ ১০৩
পাঁচ: জীবিকার কাজ যেন তাকে দীনি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না রাখে ॥ ১০৪
শারী‘য়াতের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন চাহিদা মেটানোও ‘ইবাদাত ॥ ১০৭
মু‘মিনের গোটা জিন্দেগীটাই বরং ‘ইবাদাত ॥ ১০৮
অন্যথায় মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে হয় ॥ ১১০
‘ইবাদাত না করার কারণে আল্লাহর শাস্তি প্রয়োগের যৌক্তিকতা ॥ ১১২
আল-কোরআনের মানদন্ডে ‘ইবাদাতের এই সর্বজনীনতার বিশ্লেষণ ॥ ১১৪
উপসংহার ॥ ১১৫
গ্রন্থপঞ্জি ॥ ১১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ . وَ مَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকাঃ

এ দুনিয়ায় মানব ও জ্বীনদের প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মহান স্রষ্টার ‘ইবাদাত বা দাসত্ব করা। তাঁর ‘ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেননি বলে পরিষ্কার ঘোষণা করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ “আমি জ্বীন এবং মানুষকে আমার ‘ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি” ।[১] আর যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যও তাই ছিল বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে : وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ “নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক” ।[২] সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় যে, মানুষ কখনো আল্লাহর ‘ইবাদাত ছাড়া অন্য কিছু করুক তা তিনি চান না। তাহলে কি মানুষ জীবনব্যাপী যা করে তা সবই ‘ইবাদাত হওয়া সম্ভব ? যদি তা না হয় তাহলে মানুষকে সৃষ্টি করে এই অসম্ভবের মুখোমুখী কেন করা হলো ? নাকি ‘ইবাদাত সম্পাদনের এমন কোন বিশেষ প্রক্রিয়া বিদ্যমান যাতে জীবনের সকল মুহূর্তকেই ‘ইবাদাতে পরিণত করা যায় ? এবং মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে মহান আল্লাহর যে উদ্দেশ্য তাও বাস্তবায়িত হয়। মোটকথা ইসলামে ‘ইবাদাতের আসল পরিচয় ও পরিধি কি ? এটিই এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

এ বিষয়ে লিখা পাণ্ডুলিপিটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে জমা দিলে তারা এর উপর আলোচনার জন্য একটি স্টাডি সেশনের আয়োজন করেন। সেখানে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দীনী শিক্ষায়তনের কয়েকজন গবেষক

---

১. আল-কোরআনঃ সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১: ৫৬
২. আল-কোরআনঃ সূরা আন্-নাহল, ১৬: ৩৬

পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। তাঁদের সেই মূল্যবান পরামর্শগুলোর আলোকে আমি বইটিকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছি। 'ইবাদাত বিষয়ে আমার এ লিখাটিকে আরো তথ্যনির্ভর এবং মানসম্পন্ন করার জন্য যেসব সম্মানিত গবেষক তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে এর উত্তম প্রতিফল দান করুন। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখনো এ বইয়ে যে কোন ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে এমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

বইটি ছাপানোর দায়িত্ব নেয়ায় আমি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত পরিচালক মহোদয়কে আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিসমূহকে ক্ষমা করুন। সুধী পাঠক সমাজকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

‘ইবাদাতের পরিচয়

‘ইবাদাত (عِبَادَةٌ) আরবী শব্দ। আরবী ভাষার শব্দ হলেও সকল ভাষাভাষী মুসলিমের কাছেই এটি অতীব পরিচিত। এটি একটি প্রসিদ্ধ ইসলামী পরিভাষা। আল কোরআনে এ শব্দটি বিভিন্নভাবে মোট ২৭৬ বার এসেছে।[৩]

‘ইবাদাত শব্দটি (عَبَدَ) ‘আবাদা’ শব্দের ক্রিয়ামূল, যার অর্থ (اَلطَّاعَةُ) আনুগত্য করা, দাসত্ব করা, গোলামী করা, (اَلتَّذَلُّلُ وَالْخُضُوْعُ) বিনয়ী হওয়া, অনুগত হওয়া,[৪] (اَلْإِتِّبَاعُ وَالْإِنْقِيَادُ) মেনে চলা ইত্যাদি। ইংরেজীতে যার অর্থ করা হয়- to serve, worship, adoration, devotional service, divine service and submission etc.[৫] মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের অনুগত হওয়া ও তাঁর বিধান মেনে চলাকে শারী‘য়াতের পরিভাষায় ‘ইবাদাত বলা হয়।

কোরআনুল কারীমে মহান রাব্বুল ‘আলামীন ‘আব্দ ও ‘ইবাদ শব্দদ্বয়কে দাস ও গোলাম অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে (একবচনে) ‘আব্দ এবং (বহুবচনে) ‘ইবাদ বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ অন্যান্য নবী-রাসূলদেরকে তিনি আল-কোরআনে তাঁর ‘আব্দ বলে পরিচয় দিয়েছেন।[৬] এছাড়াও তাঁর অন্যান্য অনুগত বান্দাদেরকে তিনি ‘ইবাদুর রাহমান বলে উল্লেখ করে তাঁদের গুণকীর্তন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا ....)

---

৩ . আল-হিমসী, ড. মুহাম্মাদ হাসান, মুফরাদাতুল কোরআন: তাফসীর ওয়া বায়ান, (বৈরূত: দারুর রশীদ, তা. বি.), পৃ. ১৪৩-১৪৪

৪ . আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল-‘ইবাদাহ ফিল ইসলাম (বৈরুত: মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, মু- ২৪, ১৯৯৩), পৃ- ২৭-২৮

৫. HANS WEHR, A Dictionary of Modern Written Arabic, (London: 3rd printing, May 1980), P. 586.

৬. আল-কোরআন: সূরা- ২:২৩; ৪:১৭২; ৮:৪১; ১৭:১, ৩; ১৮:৬৫; ১৯:২, ৩০; ২৫:১; ৩৮:১৭, ৩০, ৪১, ৪৪; ৩৯:৩৬; ৪৩:৫৯; ৫৩:১০; ৫৪:৯; ৫৭:৯; ৯৬:১০

“রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা যমীনের বুকে নরম হয়ে চলে। আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে ‘সালাম’ (দিয়ে বিদায়) করে। ...... ”[৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে আল্লাহর ‘আব্দ বা বান্দাহ হিসেবে পরিচয় দিতে খুবই স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। এক হাদীসে তিনি এভাবে বলেছেন:

أَنَّ أُنَاسًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا ، وَسَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ مَنْزِلَتِيْ الَّتِيْ أَنْزَلَنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : (اَلسَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) .

“কতিপয় লোক একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বললো- হে আল্লাহর রাসূল! হে উত্তম! হে উত্তমের ছেলে! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের ছেলে! তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও, তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আমি হলাম মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। আমি এটা পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে আল্লাহর দেয়া মর্যাদার চেয়ে উপরে স্থান দাও। অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন: সাইয়্যিদ হলেন মহান আল্লাহ।”[৮]

আল্লাহর দেয়া এই অভিধাই তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিল। এটিকেই তিনি তাঁর নিজের সবচেয়ে বড় পরিচয় বলে মনে করতেন। নিজ উম্মাতকেও তাই তিনি এভাবেই শিক্ষা দান করেছেন। এমনকি প্রতিদিন শুধু ফরয নামাযেই নয়বার তিনি আমাদেরকে এই ঘোষণা দিতে শিখিয়েছেন। যদ্দরুন আমরা নামাযের তাশাহ্হুদে এভাবে পড়ি-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

---

৭. আল-কোরআন: সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৬৩-৭৬

৮. আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ ইমাম আহমাদ (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, মু. ২ ১৪২০ হি.), খ. ২০, পৃ. ২৩

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।'

মা'বুদ (مَعْــبُوْدٌ), 'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) ও 'আব্দ (عَبْدٌ) :

'আরবী মা'বুদ (مَعْــبُوْدٌ) শব্দটি 'ইবাদাত (عِبَادَةٌ) ধাতু থেকে কর্ম বাচক বিশেষ্য। অর্থাৎ যার 'ইবাদাত করা হয়। ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়- Worshiped, Adored, Deity, Godhead, Idol and Master etc.[৯] এখান থেকেই 'আব্দ (عَبْدٌ) শব্দটি দাস বা চাকর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, 'আব্দ যা করে তাই 'ইবাদাত, দাস যা করে তাই দাসত্ব এবং চাকর যা করে তাই চাকুরী। মহান আল্লাহ হলেন আমাদের মা'বুদ আর আমরা হলাম তাঁর 'আব্দ। তিনি হলেন আমাদের মনিব আর আমরা হলাম তাঁর দাস। মা'বুদ তথা মনিবের কাজ হলো হুকুম দেয়া , আর 'আব্দ তথা দাসের কাজ হলো সে হুকুম পালন করা। এ কারণেই 'আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই'- এ কথার অর্থ হলো তিনি ছাড়া কোন হুকুমকর্তা নেই, আইন ও বিধানদাতা নেই। আর তাই আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলতে আদিষ্ট।

আল্লাহর হুকুম তথা আইন ও বিধানগুলোই হলো ইসলাম। মানুষের জন্য এটিই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র বিধান। এছাড়া অন্য কোন মত, পথ ও বিধান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

(إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ اْلإِسْلاَمُ)

"নি:সন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (জীবন ব্যবস্থা) হলো ইসলাম"।[১০]

(وَمَنْ يَــبْــتَغِ غَيْرَ اْلإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اْلآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ)

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন বিধান অবলম্বন করতে চায়, কস্মিনকালেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবেনা। এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত"।[১১]

---

[৯] HANS WEHR, P. 587.

[১০] আল-কোরআন: সূরা আলি-'ইমরান, ৩:১৯

[১১] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৮৫

তাই মানুষের উচিত বিধানদাতা হিসেবে শুধু তাঁকেই মেনে নেয়া এবং নিজেদের আবিষ্কার করা মত ও পথকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য না দেয়া। কেননা বিশ্বলোকের মহান স্রষ্টা এবং এর একচ্ছত্র মালিক হিসেবে এটি আল্লাহ তা'আলার জন্যই সংগত যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য যথার্থ বিধান রচনা করবেন এবং তাদেরকে তাঁর সে বিধান মেনে চলার আদেশ করবেন। আর এ কারণেই তিনি হলেন একমাত্র মা'বূদ। তাঁর বিধানের অনুসরণই হলো 'ইবাদাত এবং যারা এই বিধান অনুসরণের জন্য আদিষ্ট তাদেরকেই বলা হয় 'আব্দ।

'ইবাদাত ও ঈমান :

'ইবাদাত ও ঈমানের মাঝে রয়েছে এক চমৎকার আত্মিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক যথার্থরূপে নিরুপণ করতে পারলে 'ইবাদাতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা সহজতর হবে। কেননা ঈমান হলো 'ইবাদাত তথা আমলের ভিত্তি। ঈমান ছাড়া আমল মূল্যহীন। তাছাড়া সাধারণভাবে মানুষের কর্মে তার চিন্তা চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ যা সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাই সে কর্মে পরিণত করে। এবং সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে যা করা হয় তা অবশ্যই একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে কাজের পেছনে কোন লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য কিংবা আকীদা-বিশ্বাস নেই, সে কাজে নিষ্ঠা থাকে না এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়। বিশেষ করে ইসলামের বেলায় ঈমান হলো আমলের পূর্বশর্ত। ঈমান বিহীন আমলের কোনই মূল্য নেই। এ কারণেই হাদীস শরীফে ঈমানকে ইসলামের প্রথম স্তম্ভ স্থির করা হয়েছে। এবং অন্যান্য স্তম্ভগুলোকে এ স্তম্ভটির উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ঈমান শব্দটিও 'আরবী। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস স্থাপন। আর শারী'য়াতের পরিভাষায় ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী কাজ করার নাম। অর্থাৎ ইসলামী বিধিমালাকে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও স্বীকৃতি দানই ঈমান। গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সদিচ্ছা না থাকলে শুধু মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারা মু'মিন হওয়া যায়না। এ জন্যেই আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা ইত্যাদি হিসেবে মানা সত্ত্বেও মু'মিন হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়ার পর তাঁকে শুধু 'খালিক' বা স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিলেই মু'মিন হওয়া যায় না। বরং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য অবশ্য পালনীয় বিধি বিধান তিনিই রচনা করেছেন অন্য কেউ নয় এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান পালন করা যাবে না- একথা অকপটে মেনে নিলেই সত্যিকার

মু'মিন হওয়া যায়। এ কারণেই ঈমান তথা বিশ্বাসের অনিবার্য দাবী হিসেবে ‘ইবাদাত তথা বাস্তব কর্ম সম্পাদন করতে হয়। ঈমান বিহীন ‘ইবাদাত যেমন মূল্যহীন, আবার ‘ইবাদাত বিহীন ঈমানও তেমন মূল্যহীন। আরবের মুশরিকরা রব হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করত। কিন্তু তারা তাদের ‘ইবাদাত বা উপাসনার বেলায় আল্লাহর সাথে অন্যান্য মূর্তিদেরকে শরীক করত। মহান আল্লাহ বলেন:

(قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُوْنَ)

“বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবে: সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? বলুন: সপ্তাকাশ ও মহান আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবে: আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবে: আল্লাহর। বলুন: তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?”[১২] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ)

“আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহ।”[১৩]

এমনকি তাদের নিজেদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবেও তারা আল্লাহকে স্বীকার করত। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

---

[১২] আল-কোরআন: সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৮৪-৮৯

[১৩] আল-কোরআন: সূরা আয্-যুখরুফ, ৪৩:৯

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)

"যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"[১৪] কোরআনুল কারীমে তাই সকল মানুষকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে- "হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবের 'ইবাদাত কর"।[১৫] অর্থাৎ তোমরা সবাই যাকে রব হিসেবে মানছ, তিনিই কেবল তোমাদের দাসত্ব পাওয়ার উপযুক্ত, অন্য কেউ নন। রব হিসেবে যেহেতু সকলেই তাঁকে মানছ, তাই কেবল তাঁরই 'ইবাদাত কর।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে একথা স্পষ্টরূপে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে স্বীকার করত এবং তাঁকেই তারা নিজেদের এবং অন্যদেরও স্রষ্টা বলে জানত। তথাপি শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ায় তারা ছিল ঈমানের গন্ডি বহির্ভূত। এবং এই স্বীকৃতির পরও কোরআন তাদেরকে মু'মিন বলেনি, বরং মুশরিক বলেছে। অতএব, ঈমান ও 'ইবাদাত একটি অপরটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। শুধু ঈমানের ঘোষণা দিয়ে বসে থাকলে চলবে না; 'ইবাদাতের মাধ্যমে ঈমানের স্বীকৃতির বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে। তাহলেই প্রকৃত মু'মিন হওয়া যাবে।

ঈমান হলো 'ইবাদাতের প্রবেশদ্বারঃ

(بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ) ইসলাম পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ঘর বা ইমারত যেমন কয়েকটি খুঁটির উপর দন্ডায়মান হয় ঠিক তেমনি ইসলাম নামক ইমারতটির ভিত্তিও পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত ইসলামকে একটি ইমারত বা প্রাচীর সাদৃশ বুঝাবার জন্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে (بِنَاء) 'বিনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হলো ভিত্তি স্থাপিত হওয়া, নির্মিত হওয়া, কোন কিছুর প্রারম্ভ হওয়া ইত্যাদি। আর যেহেতু তৎকালীন আরবে তাঁবুর প্রচলন ছিল সমধিক, যা পাঁচটি খুঁটি ছাড়া হয়না , তাই এখানে পাঁচ সংখ্যাটির ব্যবহার প্রণিধান যোগ্য। তাছাড়া কোন তাঁবুর বেলায় যেমনি পাঁচটি খুঁটির মধ্যে মাঝের খুঁটিটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ছাড়া তাঁবুটির অস্তিত্বই টিকেনা, বা তাঁবুটি সঠিক অর্থে বাসযোগ্য হয়না, তদ্রুপ ইসলামের পাঁচটি খুঁটির মধ্যেও ঈমানের গুরুত্ব সর্বাধিক। এবং ঈমানের

---

[১৪] আল-কোরআনঃ সূরা আয্-যুখরুফ, ৪৩:৮৭

[১৫] আল-কোরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১

অবর্তমানে অন্যান্য খুঁটিগুলো মূল্যহীন। ঈমানকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাই করা যায় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলাম কিছুতেই পরিপূর্ণ হতে পারে না।

সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَالْحَجِّ .

"ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। (এক) এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। (দুই) সালাত প্রতিষ্ঠা করা। (তিন) যাকাত আদায় করা। (চার) রামাদানে সিয়াম পালন করা ও (পাঁচ) হাজ্জ করা।"[১৬]

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয় ইসলামের মৌলিক খুঁটি। যার প্রথমটি নিরেট বিশ্বাস এবং পরবর্তীগুলো বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। অন্য কথায় প্রথমটি হলো ঈমান আর পরবর্তীগুলো হলো 'আমল বা 'ইবাদাত।

'ইবাদাতের পরিশুদ্ধতা ঈমানের পরিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল:

ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো (اَلتَّصْدِيْقُ) **কোন কিছুর প্রতি** বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাকে সত্যায়ন করা। আর 'ইবাদাতের শাব্দিক অর্থ হলো (اَلْخُضُوْعُ وَالتَّذَلُّلُ) (নতি স্বীকার করা, অনুগত হওয়া ইত্যাদি। কারো কাছে নতি স্বীকার করতে হলে কিংবা কারো প্রতি অনুগত হতে হলে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য। আর এ বিশ্বাস যার যত মজবুত হবে, আনুগত্যও তার তত নিবিড় হবে। অপরদিকে কারো প্রতি বিশ্বাসই যদি হয় সংশয়পূর্ণ, তাহলে তার আনুগত্যও হবে দায় সারা গোছের এবং তা কোনক্রমেই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই বিশুদ্ধ 'ইবাদাতের জন্য পূর্বশর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। এরূপ বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিকেই হাদীস শরীফে জান্নাতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:[১৭]

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

---

[১৬] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৮ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৬

[১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই বলে স্বীকৃতি দিল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের পর সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করবে, সে শাস্তিযোগ্য কোন পাপের কারণে খন্ডকালীন সময়ের জন্য জাহান্নামে গেলেও শেষ পর্যন্ত তাকে তার ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য এক হাদীসের বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ ! قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ سَعْدَيْكَ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ سَعْدَيْكَ ! ثَلاَثًا . قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْا ؟ قَالَ : إِذاً يَتَّكِلُوْا . وَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ كِتَابِ الْعِلْمِ .

"আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাওয়ারীর পিছনে আরোহনকারী মু'আয (রা.) এক সংক্ষিপ্ত সফরে ছিলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: হে মু'আয ইবন জাবাল। তিনি (মু'আয) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সমীপে আমি হাজির ও আপনার একান্ত আনুগত্যের জন্য আমি প্রস্তুত। তিনি আবারো বললেন: হে মু'আয! মু'আয আবারো জবাব দিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সমীপে আমি হাজির ও আপনার একান্ত আনুগত্যের জন্য আমি প্রস্তুত। এভাবে তিন বার হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তিই অন্তরের অন্তস্থল থেকে সততার সাথে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য আগুনকে হারাম করে দিবেন। এবার মু'আয (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এটা মানুষদেরকে জানিয়ে দেব না, তাহলে তারা সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হবে? তখন তিনি (রাসূল) বললেন: তাহলে তারা অলসতা করবে। (রাবী বলেন) মু'আয (রা.) এ হাদীসের সংবাদটি তার মৃত্যুর

সময় (রাসূলের হাদীস গোপন করলে) গোনাহ হওয়ার আশংকায় বলে যান। ইমাম বুখারী 'ইলম অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন"।[১৮]

পক্ষান্তরে কাফিরদের যেহেতু ঈমান নেই তাই তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

'কাফিররা দুনিয়াতে যখন কোন ভাল কাজ করে তখন তার বদলা তাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মু'মিনরা যখন কোন ভাল কাজ করে তখন তার বদলা তার জন্য সঞ্চিত রেখে দেয়া হয়। পরকালে তাকে তা দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে কাফিরের ন্যায় সেও যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে, তা নিছক তার ঈমানের ফসল।'[১৯] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিশুদ্ধ ঈমানের ফলে আমল গ্রহণযোগ্য হয়। ফলশ্রুতিতে দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর নি'আমত ভোগ করা যায়, তেমনি পরকালেও এই মাকবুল আমলের উসিলায় আল্লাহর সন্তুষ্টি তথা জান্নাত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কাফিরের ভাল কাজগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় দুনিয়াতেই তাকে তার বদলা দিয়ে ফেলা হয়।

'শাহাদাতান' বা সাক্ষ্যদ্বয়ের সাথে 'ইবাদাতের সম্পর্ক:

আমরা উপরে বলে এসেছি, ইসলামের প্রথম খুঁটি হলো ঈমান। আর ঈমান হচ্ছে মূলত: দুটো মৌলিক সাক্ষ্যের সমন্বিত রূপ। 'আরবীতে এ সাক্ষ্য দুটোকে **'শাহাদাতান'** বলা হয়। যা মুসলিম সমাজে ঈমান বা কালিমা নামে খ্যাত। আর যে বাক্যটিতে এ দুটো সাক্ষ্য একসাথে রয়েছে, তাকে **'কালিমায়ে শাহাদাত'** বলা হয়। এ সাক্ষ্য দুটোর সাথে 'ইবাদাতের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। কেননা এই সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমেই বান্দাহ তার নিজের উপর 'ইবাদাতের জিম্মাদারী চাপিয়ে থাকে। তাইতো যারা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে না, তারা ঈমানের গন্ডির ভেতর প্রবেশ করতে পারে না এবং তাদের উপর 'ইবাদাতের দায়িত্বও বর্তায় না। আর সাক্ষ্যবিহীন তারা তাদের উপর আরোপিত 'ইবাদাতের দায়িত্ব পালন করলেও তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কাজেই এ সাক্ষ্যদ্বয়ের সাথে 'ইবাদাতের এক

---

১৮. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, আল-লু'লু' ওয়াল মারজান ফী মাত্তাফাকা 'আলাইহি আশ-শাইখান, (রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস সালাম, মু. ১, ১৪১৪ হি.), খ. ১, পৃ. ২৬-২৭, হাদীস নং- ২০

১৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮০৮

অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজ করলেই তা হয় ‘ইবাদাত, আর এ সাক্ষ্যবিহীন যা করা হয় তা ‘ইবাদাত নয়।

প্রথম সাক্ষ্যঃ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তথা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ‘ইলাহ’ বা ‘মা‘বুদ’ নেই। সাধারণভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ করা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা‘বুদ নেই। কিন্তু বিজ্ঞ ‘আলিমগণের মতে এভাবে অর্থ করা ঠিক নয়। কেননা সত্যিকার মুসলিম ব্যতীত অন্যসব মত ও পথের লোকেরা গাছ পালা, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গরু বাছুর ইত্যাদির পূজা অর্চনা করে থাকে এবং এগুলোকেই তারা উপাস্য বলে মনে করে। প্রকৃত অর্থে এসব বস্তু আল্লাহর সৃষ্টি এবং তারা সবাই একমাত্র আল্লাহরই গুণকীর্তনে মগ্ন থাকে। এরা নিজেরা ইলাহ নয়; বরং এরা হল প্রকৃত ইলাহ আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনেরই সৃষ্টি। এতদসত্ত্বেও মক্কার মুশরিকরা যেসব মূর্তির উপাসনা করত, এদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তাদের ভাষায় ইলাহ বলেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ যাদেরকে এরা উপাস্য বলে মনে করেছে , এরা সবই বাতিল ইলাহ এবং আমিই একমাত্র সত্য ইলাহ।

তাছাড়া, আল-কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী কেবল মানুষ এবং জ্বীন জাতিকেই ইচ্ছাশক্তি প্রদান করা হয়েছে। তাই সে ভাল ও মন্দ দুটোই গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগত এবং তাঁরই প্রশংসায় নিয়োজিত। সুতরাং এসব সৃষ্টিকে মা‘বুদ বলে মনে করা অবান্তর। তাই কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করবে তখন সে অবশ্যই অন্য সমস্ত বাতিল উপাস্যদের কথা অস্বীকৃতি জানিয়ে এক আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নেবে। এ কারণেই এই সাক্ষ্যের প্রথমাংশ (نَفِي) বা না সূচক এবং শেষাংশ (إِثْبَاتِ) বা হাঁ সূচক। অর্থাৎ কোন মা‘বুদই নেই কেবল আল্লাহ ছাড়া। অতএব প্রথম সাক্ষ্যের প্রকৃত মর্ম হচ্ছে- “আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা‘বুদ বা হুকুমকর্তা নেই।”

দ্বিতীয় সাক্ষ্যঃ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথমত: তাঁকে আল্লাহর বান্দাহ বলে সাক্ষ্য দানের ফলে আল্লাহর সাথে তাঁকে অংশীদার মনে করার অবকাশ থাকে না। এবং তিনিও মানব জাতির একজন

বিধায় মানুষ হিসেবে আমরাও তাঁকে অনুকরণ করতে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে আসেন তা সবই সত্য। তিনি আল্লাহর বিধান সমূহের যথার্থ পালনকারী এবং প্রচারক। তাঁর আদেশ নিষেধ অবশ্যই পালনীয়। তাই ঈমানের দাবীদার হিসেবে আমরা অবশ্যই তাঁর পদাংক অনুকরণ করে চলব।

সাক্ষ্যদ্বয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক:

উপরোক্ত দুটো মৌলিক সাক্ষ্যই হলো ঈমানের মূল কথা। এই দুটোকে আলাদা আলাদা সাক্ষ্য বলা হলেও আসলে দুটোই একটি আরেকটির পরিপূরক। 'ইবাদাতের দিক বিবেচনা করলে দুটো সাক্ষ্যের কোনটিই এককভাবে পরিপূর্ণ নয়। এবং এ কারণেই কোন 'ইবাদাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এগুলো একত্রে শর্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই প্রতিনিধি এবং প্রচারক। তাঁর রিসালাতকে মেনে না নিলে মহান আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে চলা সম্ভব নয়। তাই তাঁকে মহান আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দান করলে আল্লাহর একত্ববাদেরই পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে তাঁর রিসালাত নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে আল্লাহর একত্ববাদের দাবীই মিথ্যা বলে গণ্য হয়। তাই এ দুটো সাক্ষ্যের সমষ্টিই হলো ঈমান। এর কোন একটি এককভাবে পরিপূর্ণ ঈমান নয়।

'ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ:

মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের পরিপূর্ণ স্বীকৃতিরই অপর নাম হলো ঈমান। মানুষের পক্ষ থেকে যে কোন 'ইবাদাত অনুষ্ঠানের জন্য এই ঈমান হলো পূর্বশর্ত। ঈমান না এনে মানুষ কল্যাণকর যত কাজই করুক তা 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। এমনকি ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাত তথা সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি যথানিয়মে আদায় করলেও তা 'ইবাদাত বলে গণ্য হবে না। মুনাফিকরা মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করা সত্ত্বেও তা 'ইবাদাত বলে গণ্য হয়নি। বরং প্রকৃত মু'মিন না হয়ে তাদের এসব আচরণ ছিল ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে কপটতা তুল্য। তাই 'ইবাদাত অনুষ্ঠানের জন্য এই ঈমান হলো পূর্বশর্ত। ঈমানের ঘোষণা দিলেই কেবল 'ইবাদাতের প্রশ্ন দাঁড়ায়; অন্যথায় নহে। তাছাড়া ঈমানের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত কাউকে

'ইবাদাতের দিকে আহ্বানও করা যায় না। অথবা আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতের দায়িত্বও তার উপর বর্তায় না। পক্ষান্তরে যখনই কেউ ঈমানের ঘোষণা দেয় তখন তার অনিবার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর 'ইবাদাতে মগ্ন হওয়া। অর্থাৎ জীবনের সকল কর্মকান্ডকে মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন করে পরিচালনা করার মাধ্যমে তাকে 'ইবাদাতে পরিণত করা। আর এমনটি করার একমাত্র উপায় হলো ঈমানের ভিতর ঘোষিত সাক্ষ্য দুটির কথা সকল কাজের বেলায় স্মরণে রাখা। এজন্যেই বলা হয় যে, কোন 'ইবাদাত বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রধানত: দুটো শর্ত রয়েছে। আর তা হলো-

প্রথম শর্ত: 'আল-ইখলাস' বা একনিষ্ঠ রূপে 'ইবাদাতটি কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া। এই শর্তটি প্রথম সাক্ষ্যে পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। কেননা আল্লাহ ছাড়া অপর কোন ইলাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে আমরা প্রকারান্তরে আমাদের সকল কাজকে কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করে দিই। আমাদের কর্মকান্ডের মাধ্যমে আমরা যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টি আশা করি না এবং আর কারো সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না - একথা আমরা প্রথম সাক্ষ্যের মাধ্যমে জানিয়ে দিই। মূলত: এরূপ একনিষ্ঠ 'ইবাদাতই মহান আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে চান। তিনি বলেন:

(وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ)

"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক দীন।"[২০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন: (أَلاَ للهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ) "জেনে রেখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।"[২১]

অতএব একজন ঈমানদারের কোন আমল তখনই 'ইবাদাত হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে যখন সে তা কেবল আল্লাহরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সম্পাদন করবে। অপরাপর কোন মানুষের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হলে তা শিরক বলে গণ্য হবে। এবং মহান আল্লাহর কাছে তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

২০. আল-কোরআন: সূরা আল-বাইয়েনাহ, ৯৮:৫

২১. আল-কোরআন: সূরা আয্-যুমার, ৩৯:৩

দ্বিতীয় শর্তঃ 'আল-মুতাবাআ' বা রাসূলের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী 'ইবাদাত সম্পাদন করা। এই শর্তটি দ্বিতীয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দানের অর্থই হলো তাঁর অনুসৃত আদর্শকে মাথা পেতে নেয়া। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু আল্লাহর বান্দাহ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের মর্যাদা সম্পন্ন, সুতরাং স্রষ্টার আনুগত্যের প্রকৃত নমুনা কেবল এই বান্দার নিকট থেকেই গ্রহণীয়। আর এই অর্থেই মহান আল্লাহ তাঁকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ বানিয়ে পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

"নি:সন্দেহে তোমাদের জন্য রাসূল-এর জীবনেই রয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।"[২২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে আমাদের জন্য যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, এ ঘোষণা দিয়েই মহান আল্লাহ ক্ষান্ত হননি। তিনি আমাদেরকে তাঁর আনীত আদর্শকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করার নির্দেশও প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন:

(وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَـــنْهُ فَانْـــتَـــهُوْا .)

"আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক"।[২৩]

সুতরাং আল্লাহর 'ইবাদাতের বেলায় আমরা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকরণের জন্যই আদিষ্ট। এবং এক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত কোন পদ্ধতি বানিয়ে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং মূল 'ইবাদাতে সামান্যতম কম কিংবা বেশি করারও কোন অনুমতি ইসলামী শারী'য়াতে রাখা হয়নি। আর এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিভিন্ন কাজ সাহাবীদের সামনে করেছেন। অত:পর তাদেরকেও তাঁর মত করে সেই কাজ করতে আদেশ করেছেন। যেমন এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন: (صَلُّوْا كَمَا رَأَيْـــتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ) 'তোমরা সেভাবে নামায পড়, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ'।[২৪] অন্য হাদীসে তিনি বলছেন: (خُذُوْا

---

[২২] আল-কোরআনঃ সূরা আল-আহযাব, ৩৩:২১

[২৩] আল-কোরআনঃ সূরা আল-হাশর, ৫৯:৮

[২৪] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৬৩১

عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ) 'তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হাজ্জের নিয়মগুলো জেনে নাও'।[২৫] .... ইত্যাদি।

তাছাড়া لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ বলার মাধ্যমে আমরা যখন একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্বকেই বরণ করে নেয়ার ঘোষণা দিলাম, তখন এর পরপরই আবার مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ বলার মাধ্যমে আমরা এই দাসত্বের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই নিজেদের কাছে অনুকরণীয় বলে স্বীকৃতি দিলাম। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য প্রেরিত আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। তিনি একদিকে আল্লাহর বান্দাহ, অপরদিকে তাঁর রাসূল। বান্দাহ হিসেবে তিনি আল্লাহর বন্দেগী করতে আদিষ্ট, আর রাসূল হিসেবে তিনি তাঁর উম্মাতের মাঝে বন্দেগীর পন্থা বাতলে দেয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। সুতরাং এ দায়িত্বে নিজেদের ইচ্ছামত আর কাউকে নিয়োজিত করার কোন অধিকার কেউ রাখে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতগুলো নিজে সম্পাদন করে দেখিয়েছেন এবং সেভাবে তা সম্পাদনের জন্য সাহাবীদেরকে আদেশ করেছেন। আর নিজেদের ইচ্ছামত বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

অতএব কোন ঈমানদারের আমল তার নিজের কিংবা অন্য কারো আবিষ্কৃত পন্থায় সম্পাদিত হলে তা 'ইবাদাত রূপে গণ্য হবে না। বরং তা হতে হবে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায়।

'ইবাদাতের সংজ্ঞা নিরূপণে বিভিন্ন মনীষীর উক্তি:

- **শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (মৃ. ৭২৮ হি.) (রহ.) প্রদত্ত সংজ্ঞা:**

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) বলেন:

اَلعِبَادَةُ هِيَ طَاعَةُ اللهِ بِامْتِثَالِ مَا أَمَرَ بِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ .

"ইবাদাত হচ্ছে রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তা মেনে চলা।"

তিনি আরো বলেন-

اَلْعِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ .

---

[২৫] আল-বাইহাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন, আস্-সুনানুল কুবরা (মক্কা আল-মুকাররামাহ: মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি.), খ. ৫, পৃ. ১২৫

“আল্লাহ্ যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন এমন সকল প্রকাশ্য ও গোপণীয় কাজ ও কথার নাম ‘ইবাদাত।”[২৬]

- **ইমাম কুরতুবীর (মৃ. ৫৯৫ হি.) (রহ.) সংজ্ঞা:**

‘ইবাদাতের সংঙ্গা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী (রহ.) লিখেছেন:

اَلْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَوْحِيْدِهِ وَالْتِزَامِ شَرَائِعِ دِيْنِهِ وَأَصْلُ الْعِبَادَةِ اَلْخُضُوْعُ وَالتَّذَلُّلُ .

“‘ইবাদাত হলো মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া এবং তাঁর দীনের বিধানসমূহের অনুসরণ করা। আর ‘ইবাদাতের মূল হলো বিনয় এবং নিজকে তুচ্ছ করে প্রকাশ করা।”[২৭]

- **আল্লামা ইবন কাছীরের (মৃ. ৭৭৪ হি.) (রহ.) সংজ্ঞা:**

‘ইবাদাত প্রসঙ্গে ‘আল্লামা ইবন কাছীর (রহ.) লিখেছেন:

اَلْعِبَادَةُ فِيْ اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ ، وَ فِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوْعِ وَالْخَوْفِ .

“‘ইবাদাতের শাব্দিক অর্থ হলো নমনীয়তা। আর পারিভাষিক অর্থে ‘ইবাদাত বলা হয় পরিপূর্ণ ভীতি, বিনয় ও ভালবাসার সমষ্টিকে।”[২৮]

- **ইমাম রাযীর (মৃ. ৬০৬ হি./ ১২১০ খৃ.) (রহ.) সংজ্ঞা:**

ইমাম রাযী (রহ) ‘ইবাদাত প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন। ‘আল্লামা ইউসুফ আল-কারদাবী যার সার নির্যাস করেছেন এভাবে :

إِنَّ الْعِبَادَةَ عِبَارَةٌ عَنْ نِهَايَةِ التَّعْظِيْمِ ، وَ هِيَ لاَ تَلِيْقُ إِلاَّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ غَايَةُ الْإِنْعَامِ .

---

[২৬] সুলাইমান ইবন ‘আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ‘আবদুল ওয়াহহাব, তাইসীরুল ‘আযীযিল হামীদ (বৈরূতঃ আলমাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি.),পৃ-৪৬

[২৭] আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল জামে’ লিআহকামিল কোরআন (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ১৯৯৪), খন্ড ১, পৃ- ২৪৩

[২৮] তাইসীরুল আযীযিল হামীদ, পৃ-৪৭

“‘ইবাদাত হলো সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শনের নাম। আর এই সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার অধিকারী কেবল তিনিই, যার কাছ থেকে সর্বোচ্চ নি‘য়ামাত প্রাপ্ত হওয়া যায়।”[২৯]

- **‘আল্লামা আবুল আ‘লা মওদূদীর (মৃ. ১৯৭৯ হি.) (রহ) সংজ্ঞাঃ**

‘ইবাদাতের মূল ধাতুর (ع ب د) দিক বিবেচনা করে ‘আল্লামা মওদূদী (রহঃ) লিখেনঃ

إِنَّ مَفْهُوْمَ الْعِبَادَةِ الْأَسَاسِيَّ أَنْ يَذْعَنَ الْمَرْءُ لِعُلُوِّ أَحَدٍ وَ غَلَبَتِهِ ، ثُمَّ يَنْـــزِلُ لَهُ عَنْ حُرِّيَّـــتِهِ وَ اسْتِقْلاَلِهِ .

“‘ইবাদাতের মূল কথা হলো কোন সত্তার বড়ত্বকে মাথা পেতে নেয়া, অত:পর তাঁর সামনে নিজের স্বাধীনতাকে বিলীন করে দেয়া।”[৩০] অর্থাৎ তাঁর আনুগত্যকে বরণ করে নেয়া।

- **ডঃ ইউসুফ আল-কারদাবীর ব্যাখ্যাঃ**

‘ইবাদাত প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর উপরোক্ত সংঙ্গার আলোকে ড. কারদাবী তাঁদের সকলের সংগায় উল্লেখিত মূল বিষয়গুলোর সাথে একমত হন। আর সে বিষয়গুলো হলো- (اَلْخُضُوْعُ وَ الْحُبُّ) বিনয় ও ভালবাসা। অত:পর তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ

‘ইবাদাতের উপরোক্ত তাত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলো, কোন ‘ইবাদাত শারী‘য়াসিদ্ধ হতে হলে তার মধ্যে দুটো জিনিস অবশ্যই চাই। আর সে দুটো জিনিস হচ্ছে-

একঃ ‘ইবাদাতটি চাই করণীয় হোক অথবা বর্জনীয়, অবশ্যই তা আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত হতে হবে। আর এটিই হলো আনুগত্য ও বিনয়।

দুইঃ এই আনুগত্য ও বিনয় উৎসারিত হতে হবে আল্লাহর প্রতি অন্তরের প্রগাঢ় ভালবাসা থেকে। কেননা বান্দার কাছ থেকে এহেন ভালবাসা পাবার তো তিনিই উপযুক্ত। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অফুরন্ত নি‘য়ামাত দিয়েছেন, সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, সবকিছুকে তার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাকে সকলের মাঝে

---

২৯. আল-‘ইবাদাহ ফিল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৩৭

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৮

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিজের খালীফা হিসেবে মনোনীত করেছেন ....ইত্যাদি।[৩১]

'ইবাদাত হলো বান্দার উপর আল্লাহর অধিকারঃ

'ইবাদাতের আরেকটি পরিচয় হলো এই যে, এটি বান্দার কাছে আল্লাহর অধিকার। এ অধিকার অন্য কারো নিকট ন্যস্ত করলে আল্লাহ্ নাখোশ হন। কেননা এটি কেবল তাঁরই পাওনা, অন্য কারো নয়। তিনি মহান স্রষ্টা আল্লাহ, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং গোটা বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করে তারই কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। অনস্তিত্ব থেকে যিনি অস্তিত্ব দেন, আহার-বিহার সব কিছুর যিনি ব্যবস্থা করেন, তিনি ছাড়া আর কেই বা পারেন এ বান্দার কাছে 'ইবাদাতের দাবীদার হতে? তাই তো তিনি নিজেই আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন কেন এই 'ইবাদাতের কেবল তিনিই অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেনঃ

(قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَيَقُوْلُوْنَ لله قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ . قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . سَيَقُوْلُوْنَ لله قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ . قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيْرُ وَ لاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَيَقُوْلُوْنَ لله قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُوْنَ)

"বলুন, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুনঃ তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে যাদু করা হচ্ছে?"[৩২]

তিনি আরো বলছেনঃ

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ- ৩১-৩৩

[৩২] আল-কোরআনঃ সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৮৪-৮৯

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ . فَذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُوْنَ)

"আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে তোমাদেরকে রুযী দান করেন আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন বলুন, তারপরেও তোমরা ভয় করছ না? অতএব এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদভ্রান্ত ঘুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া- সুতরাং কোথায় ঘুরছ?"[৩৩]

আবার অন্যত্র তিনি সরাসরি মানবকুলকে লক্ষ্য করেই প্রশ্ন রাখছেন। ইরশাদ হয়েছে:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ . أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ . لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ . إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ . بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ . أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ . أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ . لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ . أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ . أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়-কুটা করে দিতে পারি, তাহলে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে যাবে। বলবে: আমরা তো ঋণের চাপে পড়ে গেলাম। বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হয়ে পড়লাম। তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে লোনা করে দিতে পারি। তারপরও কি

---

[৩৩] আল-কোরআন: সূরা ইউনুস, ১০:৩১-৩২

তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি এর বৃক্ষ সৃষ্টি করেছ, না আমি সৃষ্টি করেছি?”[৩৪]

মু‘আয ইবন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى حِمَارٍ ، فَقَالَ لِيْ : يَا مُعَاذُ ، أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قُلْتُ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا .

‘(মু‘আয ইবন জাবাল (রা.) বলেন) একবার আমি গাধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে সাওয়ার ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে মু‘আয, তুমি কি জান বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার কি ? আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বান্দাদের উপর আল্লাহর অধিকার হলো এই যে, তারা কেবল তাঁরই ‘ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।’ [৩৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্পষ্ট করেই আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমাদের কাছে আল্লাহর অধিকার কি। আর এ অধিকার কতইনা সংগত সে মহান সত্তার জন্য, যিনি আমাদের সকল নি‘য়ামাতের আধার। তাই তো বান্দাহ যখন এরপরও অকৃতজ্ঞ হয়, তিনি তাতে আশ্চর্যান্বিত হন। আল-কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে:

(اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ ، وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِيْ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ، وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ . وَ آتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ ، وَ إِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ)

---

[৩৪] আল-কোরআন: সূরা আল-ওয়াকি‘আহ, ৫৬:৬৩-৭২

[৩৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ২৮৫৬ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৩০

"তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অত:পর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযক উৎপন্ন করেছেন। এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে। এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নি'য়ামাত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।"[৩৬]

আল-কোরআনের সূরা কুরাইশেও মহান আল্লাহ আহার-বিহার প্রদান এবং নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি ইঙ্গিত করেছেন। কা'বা ঘরকে যারা স্বচক্ষে দেখেছে এবং এ ঘরকে অলৌকিকভাবে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয়টি যারা প্রত্যক্ষ করেছে মক্কার সেসব কাফিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ সেখানে ইরশাদ করেন:

(فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)

"এই ঘরের যিনি রব তাদের তো উচিত তাঁর 'ইবাদাত করা। (তিনি তো ঐ সত্ত্বা) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন যুগিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন"।[৩৭]

অন্যত্র এক হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন:

(إِنِّيْ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِيْ نَبَأٍ عَظِيْمٍ : أَخْلُقُ وَ يُعْبَدُ غَيْرِيْ ! وَ أَرْزُقُ وَ يُشْكَرُ سِوَايَ ! خَيْرِيْ إِلَى الْعِبَادِ نَازِلٌ ، وَ شَرُّهُمْ إِلَيَّ صَاعِدٌ ! أَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِيْ وَ أَنَا الْغَنِيُّ عَنْهُمْ ، فَيَتَعَرَّضُوْنَ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِيْ وَ هُمْ أَفْقَرُ شَيْءٍ إِلَيَّ !!)

---

[৩৬] আল-কোরআন: সূরা ইবারাহীম, ১৪:৩১-৩৪

[৩৭] আল-কোরআন: সূরা কুরাইশ, ১০৬:৩-৪

"আমার সাথে মানুষ আর জ্বীনের এক বিস্ময়কর আচরণ বিদ্যমান। আমি সৃষ্টি করি, অথচ সে আমি ছাড়া অন্যের দাসত্ব করে! আমি রিযক দিই, অথচ সে আমাকে বাদ দিয়ে অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে! আমার কল্যাণ বান্দাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, অথচ তাদের অনিষ্ট বা অসদাচরণ আমার দিকে আসে! আমি আমার নি'য়ামাত দিয়ে তাদের ভালবাসা কুড়াতে চাই, যদিও আমি তাদের মুখাপেক্ষী নই। আর তারা আমার প্রতি তাদের অবাধ্যতা পেশ করে, অথচ তারা আমার খুবই মুখাপেক্ষী।"[৩৮]

অতএব, আমাদের নিজেদের এবং অন্য সকল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা যে মহান আল্লাহ, 'ইবাদাত পাওয়ার একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁরই। সৃষ্টিলোকের কেউই তার নিজেকেও যেমন সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি পারে না তার চারপাশের কোন কিছুকেও। সে তার নিজের কিংবা অন্য কারো রিযিকের ব্যবস্থাও করতে পারে না। মৃত্যু অথবা অন্য যে কোন প্রকার অনিষ্ট থেকেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। শত নাফরমানী সত্ত্বেও মহান আল্লাহর অফুরন্ত নি'য়ামাত আমাদেরকে সদা পরিবেষ্টন করে থাকে। আমরা নিজেদের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে সর্বদাই তাঁর নি'য়ামাতরাজীর মধ্যে ডুবে থাকি।

'ইবাদাতের ব্যাপারে সকলেই আদিষ্ট:

'ইবাদাতের ব্যাপারে শুধু নবী-রাসূলগণ, কিংবা তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ কেউ অথবা বিশেষ কোন জাতি আদিষ্ট নয়। বরং সকল নবী-রাসূল ('আ.) এবং তাঁদের উম্মাতগণও 'ইবাদাতের ব্যাপারে আদিষ্ট। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো:

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّـــهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْـــبُدُوْنَ)

"আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।"[৩৯]

---

[৩৮] আল-বাইহাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন, শু'আবুল ঈমান (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.), খ. ৪, পৃ. ১৩৪

[৩৯] আল-কোরআনঃ সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫

আর এ কারণেই তৎকালীন বিশ্ব সম্রাটদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠির শেষ কথাটি ছিল আল-কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত:

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَ لاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ .)

"বলুন: 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন একটি বিষয়ের দিকে আস- যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। (আর তা হলো এই) যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না। এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা (মহান আল্লাহর বিধানের প্রতি) অনুগত'।"[৪০]

'ইবাদাতের ব্যাপারে মানুষের প্রতি আল্লাহর এ নির্দেশনা খন্ডকালীন কোন সময়ের জন্য নয়; বরং এটি মানুষের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সে আমরণ পালন করতে আদিষ্ট। তাই তো সর্বশেষ নবী এবং রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ আদেশ করে বলছেন:

(وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .)

"আর যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা (মৃত্যু) না আসে, ততক্ষণ আপনার পালনকর্তার 'ইবাদাত করে চলুন।"[৪১]

অন্য আয়াতে ঈসা ('আ.) সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَ لاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيْعًا .)

---

[৪০] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৬৪

[৪১] আল-কোরআন: সূরা আল-হিজর, ১৫:১৯

“মসীহ আল্লাহর বান্দাহ (দাস) হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত: যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন।”[৪২]

এজন্যে সকল আসমানী ধর্মমতেই মানুষদেরকে এক আল্লাহর ‘ইবাদাতের প্রতি আহবান করা হয়েছে। এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ছিলেন স্বস্ব উম্মাতের মাঝে সর্বপ্রথম আল্লাহর ‘ইবাদাতকারী। আল-কোরআনে ‘ইবাদাতের নির্দেশ সম্বলিত প্রথম আয়াতটিও তাই কোন বিশেষ নবী বা তাঁর অনুসারীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়নি; বরং সকল মানবতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّ أَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ
أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .)

“হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ‘ইবাদাত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায় যে, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা, আর আকাশকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থির করো না। মূলত: এসব তো তোমরা জান।”[৪৩]

সুতরাং ‘ইবাদাত হলো প্রতিপাল্যের উপর প্রতিপালকের অধিকার, সৃষ্টির উপর স্রষ্টার অধিকার এবং অনুগৃহীতের উপর অনুগ্রহকারীর অধিকার। এ অধিকারকে খর্ব করা আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষের জন্য শোভনীয় নয়। এ ‘ইবাদাত প্রতিপালনের জন্য সকলেই আদিষ্ট।

‘ইবাদাত হলো ইসলামের প্রাণ:

ইসলামের সুমহান ও পরিব্যাপ্ত আদর্শ প্রতিভাত হয় এর চিরন্তন সংবিধান তথা আল-কোরআনে। এই সংবিধানের সার নির্যাস নিহিত রয়েছে ‘উম্মুল কোরআন’

---

৪২. আল-কোরআন: সূরা আন্-নিসা, ৪:১৭২

৪৩. আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১-২২

তথা সূরা আল-ফাতিহায়। আর সূরা আল-ফাতিহা হলো সাত আয়াত বিশিষ্ট। আর এই সূরার সারকথা হলো এর মধ্যবর্তী আয়াত (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ) “আমরা শুধু তোমারই ‘ইবাদাত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।”[৪৪]

তাই হাদীস শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরাকে (اَلسَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ) ‘বারংবার পঠিত সপ্ত আয়াত ও মহাগ্রন্থ আল-কোরআন’ বলে অভিহিত করেছেন।[৪৫] অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ‘ইবাদাতের ঘোষণাই হলো সূরা আল-ফাতিহার প্রাণ, আর সূরা আল-ফাতিহা হলো আল-কোরআনের প্রাণ। অপরদিকে ‘ইবাদাত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো সালাত যা সূরা ফাতিহা ব্যতীত সম্পাদিত হয় না। এভাবেই ‘ইবাদাতের অপরিহার্যতাকে মু’মিনের সার্বক্ষণিক কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। সৃষ্টিকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা, দায়িত্বের কথা। আবার তার মুখ থেকে বারংবার উচ্চারিত করা হচেছ তার দায়িত্ব অনুভূতির কথা। সে নিজের স্রষ্টার যথাযথ পরিচয় এবং পদবী উল্লেখ করে নিজের সাথে তার স্রষ্টার সুমধুর সম্পর্কের ঘোষণা দিচ্ছে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমি কেবল আমার সে মহান স্রষ্টারই ‘ইবাদাত (দাসত্ব) করি; অন্য কারো নয়। আমি কেবল সে মহান সত্তারই সাহায্য কামনা করি, অন্য কারো নয়। কেবল সে মহান স্রষ্টাই পারেন আমাকে সুপথের দিশা দিতে, অন্য কেউ নয়। এবং এ পথে চললেই তাঁর অনুগ্রহ পাওয়া যায়, অন্য কোন পথে নয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে এ যেন এক সেতুবন্ধন। এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ابْنَ آدَمَ ! أَنْزَلْتُ سَبْعَ آيَاتٍ : ثَلَاثٌ لِيْ وَ ثَلَاثٌ لَكَ
وَ وَاحِدَةٌ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ ، فَأَمَّا الَّتِيْ لِيْ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ،
اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . وَالَّتِيْ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكَ : إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ . مِنْكَ الْعِبَادَةُ وَ عَلَيَّ الْعَوْنُ . وَ أَمَّا الَّتِيْ لَكَ

---

[৪৪] আল-কোরআন: সূরা আল-ফাতিহা, ১:৪

[৪৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৫০০৬

فَهِيَ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّيْنَ .

"মহান আল্লাহ্ বলেন: হে আদম সন্তান! আমি সাতটি আয়াত নাযিল করেছি। তন্মধ্যে তিনটি আমার জন্য এবং তিনটি তোমার জন্য। আর অবশিষ্ট একটি আমার ও তোমাদের মধ্যকার। যা আমার জন্য তা হলো- 'সমস্ত প্রশংসা উভয় জাহানের প্রতিপালকের জন্য, যিনি অতিশয় দয়ালু পরম করুনাময়, বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি।' আর যা আমার ও তোমার মধ্যকার তা হলো- 'আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' তোমার কর্তব্য হলো 'ইবাদাত করা, আর আমার কর্তব্য হলো সাহায্য করা। অত:পর যা শুধুমাত্র তোমার জন্য তা হলো- 'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর। তাদের পথ যাদেরকে তুমি নি'য়ামাত দান করেছ, যারা অভিশপ্ত নয়, পথভ্রষ্টও নয়।'"[৪৬]

অপর এক হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন:

قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ ، وَ لِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ . فَإِذاَ قَالَ الْعَبْدُ : اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، قَالَ اللهُ : حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ . فَإِذاَ قَالَ : اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ اللهُ : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ . فَإِذا قَالَ الْعَبْدُ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، قَالَ : مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ . وَ إِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ، قَالَ : هَذَا بَيْنِيْ وَ بَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ إِلَى آخِرِهِ ، قَالَ : هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ .

"আমি আমার বান্দাহ ও আমার মধ্যে সালাতকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছি, বান্দাহ যা চায় তা সে পায়। যখন বান্দাহ বলে: সকল প্রশংসা উভয় জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, তখন আল্লাহ্ বলেন: বান্দা আমার শুকরিয়া আদায় করেছে। বান্দা যখন বলে: পরম দাতা ও দয়ালু, আল্লাহ্ বলেন: বান্দাহ্ আমার

---

[৪৬] আত্-তাবারানী, আল-মু'জাম আল-আওসাত (কায়রো: দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৭৯

প্রশংসা করেছে। বান্দাহ্ যখন বলে: বিচার দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, তখন আল্লাহ্ বলেন: বান্দাহ্ আমার মর্যাদা স্বীকার করেছে। আর যখন বান্দাহ্ বলে: আমরা শুধু আপনারই 'ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য চাই, তখন আল্লাহ্ বলেন: এটি আমি এবং আমার বান্দার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বান্দাহ্ যা চায় সে তা পায়। অত:পর যখন সে বলে: আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ------- , তখন আল্লাহ্ বলেন: এটি আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দাহ্ যা চাবে, সে তা পাবে।"[৪৭]

অতএব, 'ইবাদাত বিহীন ইসলাম হলো নিস্প্রাণ দেহ তুল্য। প্রাণহীন দেহ যেমন অচল ও অযথা, 'ইবাদাত না করে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করাও তেমনি বৃথা ও বেহুদা। মানব দেহের হৃৎকম্পন থেমে যাওয়া যেমন ভয়ানক, মুসলিম সমাজে 'ইবাদাতের স্পৃহা না থাকাও তেমনি ভয়ংকর। আর সম্ভবত: এ কারণেই সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি মৌলিক 'ইবাদাতগুলোকে ইসলামে সামাজিকভাবে পালনের বিধান দেয়া হয়েছে। 'ইবাদাত চর্চার ফলে ব্যক্তির মধ্যে যেমন প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, সামাজিক জীবনেও তেমনি নেমে আসে সৌহার্দ, সহানুভূতি ও একতা।

'ইবাদাত শুধু আল্লাহরই প্রাপ্য:

'ইবাদাত কেবল মহান রাব্বুল 'আলামীনই পেতে পারেন। শুধু তাঁরই উদ্দেশ্যে 'ইবাদাত নিবেদিত হয়; অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে না। ইবনে সাইয়েদাহ্ বলেন: 'ইবাদাত হলো ঐ আনুগত্যের নাম যা কেবল এমন সত্তারই প্রাপ্য যিনি সর্বোচ্চ নি'য়ামাতরাজী প্রদান করে থাকেন। যেমন- জীবন, বোধশক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি। আর এ সমস্ত নি'য়ামাত প্রদানকারী তো মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নন। তাই 'ইবাদাত শুধু তাঁরই প্রাপ্য।'[৪৮]

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী বলেন[৪৯]: 'ইবাদাত হলো সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন। এটি পাওয়ার উপযুক্ত কেবল তিনিই যিনি সর্বোচ্চ নি'য়ামাতদাতা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ নি'য়ামাত হলো মানুষের জীবন যা অন্যান্য নি'য়ামাত ভোগ করার পথ খুলে দেয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন:

---

[৪৭] ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী আবু হুরাইরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। (মুসলিম, হাদীস নং- ৩৯৫, আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৮২১ এবং তিরমিযী, হাদীস নং- ২৯৫৩)

[৪৮] আল মুখাস্সাস, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ- ৯৬

[৪৯] তাফসীরে কাবীর, প্রথম খন্ড, পৃ- ২৪২

(وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا)

“আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।”[৫০]
তিনি আরো বলেছেন:

(كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ)

“কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অত:পর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন এবং আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অত:পর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।”[৫১]
উক্ত আয়াতে মানুষের সামগ্রিক অক্ষমতা এবং স্রষ্টার প্রতি তার মুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের সর্বপ্রথম অক্ষমতা হলো তার অস্তিত্বহীনতা। সে অস্তিত্বহীন ছিল, নিজেকে নিজে অস্তিত্বে আনতে পারেনি। মহান আল্লাহই তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করে অস্তিত্বে এনে দিয়েছেন। তার দ্বিতীয় অক্ষমতা হলো, আল্লাহর দেয়া অস্তিত্বের উপর সে নিজে নিজে টিকেও থাকতে পারে না। তিনি তাকে তাঁর ইচ্ছামত নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ পর্যন্ত অস্তিত্বে রেখে তারপর মৃত্যু দান করেন। আর তার তৃতীয় অক্ষমতা হলো, মৃত্যুর মাধ্যমে সে তার জীবদ্দশায় কৃত যাবতীয় কর্মফল থেকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। তিনি তাকে পুনরায় জীবন দিয়ে তার নিজের কৃতকর্মের আলোকে পুরস্কার এবং তিরস্কারের ব্যবস্থা করেন। অতএব, 'ইবাদাত তো শুধু সেই মহান আল্লাহরই প্রাপ্য হওয়া উচিত।
তাছাড়া সৃষ্টিজগতের যা কিছু থেকে মানুষ উপকৃত হয়, তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যেই তিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষেরা এদের কাছে না চাইলেও এরা মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত। ইরশাদ হয়েছে:

(هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا)

“তিনি সেই সত্তা যিনি যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।”[৫২]

---

[৫০] আল-কোরআন: সূরা মারইয়াম, ১৯:৯
[৫১] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮
[৫২] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৯

(أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً)

“তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি‘য়ামাত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।”[৫৩]

প্রকৃতপক্ষে যত নি‘য়ামাত মানুষকে ঘিরে আছে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সে যা যা ভোগ করে; এমনকি তার আপাদমস্তক সব কিছুই মহান আল্লাহর দেয়া নি‘য়ামাত। তাই তো এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো :

(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ . ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ)

“তোমাদের কাছে যে সমস্ত নি‘য়ামাত আছে, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। অত:পর তোমরা যখন দু:খ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।”[৫৪]

পক্ষান্তরে আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের উপাসনা করা হয়, কিংবা সাহায্য চাওয়া হয় তারা কেউই স্রষ্টা নয়; সৃষ্টি। সক্ষম নয়, অক্ষম। অমুখাপেক্ষী নয়, মুখাপেক্ষী। এমনকি তারা এতই দুর্বল যে, তারা নিজেরা নিজেদেরও কোন কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেনা। এবং অন্যের অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে দেয়া আল্লাহর দৃষ্টান্ত কতইনা চমৎকার। তিনি বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ، إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ، وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ

---

[৫৩] আল-কোরআনঃ সূরা লুকমান, ৩১:২০

[৫৪] আল-কোরআনঃ সূরা আন্-নাহল, ১৬:৫৩

"হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও এর জন্য তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।"[৫৫]

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً ، وَ يَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ ، وَ لاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً ، وَ أَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوْا ، وَ يَكْرَهُ لَكُمْ : قِيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ .

"মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। পছন্দনীয় বিষয়গুলো হলো- তোমরা তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হবে না। আর অপছন্দনীয় বিষয়গুলো হলো- অযথা বাকবিতন্ডা, অত্যধিক প্রশ্নারোপ এবং সম্পদের অপচয়।"[৫৬]

অতএব যে মহান স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং যিনি তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে সব কিছুর যথাযথ ব্যবস্থা করে থাকেন, তিনিই কেবল 'ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত; আর কেউ নন। তাঁরই সামনে মাথা নত করা যাবে, আর কারো সামনে নয়। কেবল তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে, অন্য কারো বিধান নয়।

হুকূকুল্লাহ ও হুকূকুল 'ইবাদ:

পৃথিবীতে আমরা যত কাজ করি তা সবই মহান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এ সকল কাজ করা বা না করার সাথে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অথবা অসন্তুষ্টি সম্পর্কিত। আবার কোন কোনটি আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির সাথেও সম্পৃক্ত। সাধারণত: আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলোকে আমরা 'ইবাদাত বলে মনে করি।

---

[৫৫] আল-কোরআন: সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৭৩

[৫৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৭১৫

যেমন- সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি। এগুলো হলো হুকূকুল্লাহ বা আল্লাহর হক। আর বান্দাহর সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলোকে আমরা মনে করি মু'আমালাত। যেমন- সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, ওয়াদা সংরক্ষণ করা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, গীবত না করা, রোগীর সেবা করা, সাক্ষাত হলে সালাম বিনিময় করা, বেচা-কেনা ও লেন-দেনের যথাযথ নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি। এগুলো হলো হুকূকুল 'ইবাদ বা বান্দাহর হক।

মু'আমালাত (مُعَامَلَاتٌ) আরবী শব্দ। আরবী ভাষার শব্দ হলেও বাংলায় এটি বহুল প্রচলিত। ক্রিয়ামূল (عَمَلٌ) 'আমাল থেকে এর উৎপত্তি। যার অর্থ হলো কাজ বা কর্ম (action/ activity/ work ...etc.)। কোন কাজ যখন পরস্পরে মিলে করা হয়, একের সাথে অপরে করা হয় কিংবা একের উদ্দেশ্যে অপরে করা হয়, তখন তাকে আমরা মু'আমালাত বলি। অর্থাৎ পারস্পরিক আচার-আচরণ, লেন-দেন ইত্যাদিই হলো মু'আমালাত। অন্য কথায়, মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি লেন-দেন ও আচার-আচরণের যে বিধান মহান আল্লাহ দিয়েছেন তাই হলো মু'আমালাত। আর এ অর্থে মানব জীবনের প্রায় সকল কর্মকান্ডই মু'আমালাত। কেননা মানুষের সকল কাজই কোন না কোন ভাবে কারো না কারো সাথে সম্পৃক্ত।

'ইবাদাতের চেয়ে মু'আমালাতের পরিধি অনেক ব্যাপক। আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মৌলিক 'ইবাদাতগুলোও শাব্দিক অর্থে মু'আমালাত। কেননা এগুলোও দু'পক্ষের মাঝে সম্পাদিত হয়। এগুলোতে আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পৃক্ততা সুস্পষ্ট। বান্দাহ এগুলো আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করে থাকে। 'ইবাদাতে দু'টো পক্ষ থাকে। এক পক্ষে মা'বূদ বা মনিব আর অপর পক্ষে 'আব্দ বা বান্দাহ। বান্দাহ তার 'ইবাদাতের মাধ্যমে মনিবের সন্তুষ্টি চায়, তাঁর কাছ থেকে পুরস্কৃত হওয়ার আশা করে। মনিবও 'ইবাদাতের মাধ্যমে বান্দাহর প্রতি খুশী হন এবং তাকে পুরস্কৃত করেন। আবার বান্দাহ যখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো 'ইবাদাত করে, তখন তিনি নাখোশ হন এবং তাকে শাস্তি দেন। এমনিভাবে মু'আমালাতেও দু'টো পক্ষ থাকে। এক পক্ষ তাদের কর্মকান্ড ও আচরণে সঠিক হলে অপর পক্ষ তাতে উপকৃত হয় এবং খুশী হয়। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষেরই যিনি মনিব তিনিও তাতে খুশী হন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। অন্যথায় তাদেরকে তিনি তিরস্কার করেন ও শাস্তি দেন। এ কারণেই আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির সাথে আমরা যেসব আচার-আচরণ করি, তা যদি আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় করি, তখন তা 'ইবাদাতও বটে। যেমন- ব্যবসায় করতে গিয়ে আমরা যদি মালে

ভেজাল না মিশাই, মিথ্যা না বলি, ওজনে কম না দেই, মালের দোষ গোপন না করি, তাহলে তা যেমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ বা ভাল মু'আমালাত, তেমনি তা আল্লাহর 'ইবাদাতও। তাই এগুলোর জন্য তিনি আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আর যদি ব্যবসায় করতে গিয়ে আমরা এর উল্টোটা করি তাহলে তা একদিকে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অসদাচরণ বা মন্দ মু'আমালাত এবং অপরদিকে তা আল্লাহর নাফরমানীও। তাই এগুলোর জন্য তিনি আমাদেরকে তিরস্কৃত করবেন ও শাস্তি দেবেন। এভাবেই 'ইবাদাত ও মু'আমালাত একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে 'ইবাদাতের চেয়েও মু'আমালাতের গুরুত্ব আরো বেশী। কেননা সকল (ভাল) মু'আমালাতই 'ইবাদাত এবং কিছু কিছু (মন্দ) মু'আমালাত 'ইবাদাতের বাইরেও রয়েছে।

বান্দাহর 'ইবাদাত বা দাসত্ব পাওয়ার একমাত্র হকদার হলেন আল্লাহ। এজন্যে 'ইবাদাতগুলোকে বলা হয় 'হুকূকুল্লাহ' বা আল্লাহর হক। অপরদিকে মু'আমালাত বা আচার-আচরণগুলোকে বলা হয় 'হুকূকুল 'ইবাদ' বা বান্দাদের হক। বান্দাহ যদি আল্লাহর হক প্রতিপালনে কোন গাফিলতি করে, তাহলে এর জন্য আল্লাহর কাছে তাকে দায়ী থাকতে হয়। তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আর যদি অন্য কোন বান্দাহর হক আদায়ে গাফিলতি করে, তাহলে ঐ বান্দাহর কাছে তাকে দায়ী থাকতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আপসরফা বা সুরাহা না করে থাকলে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। বরং কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ পাওনাদারের পক্ষ অবলম্বন করে তার হক আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। সেদিন জ্বীন এবং মানুষ থেকে পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়া হবে এবং তাদের মধ্য থেকে সৎকর্মশীলদেরকে জান্নাত এবং অসৎকর্মশীলদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য সকল বিচরণশীল প্রাণীকেই পুনর্জীবিত করা হবে এবং বিচারের আওতায় আনা হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো:

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاَ طَائِرٍ يَطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ)

"আর যত প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি প্রাণী। আমি কোন কিছুই

কিতাবে বাদ দেইনি। অত:পর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের নিকট সমবেত হবে"।[৫৭]

বাইহাকী, ইবন জারীর ও ইবন আবী হাতিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন:

يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا فَيَفْصِلُ بَيْنَهَا بِحُكْمِهِ الْعَدْلِ الَّذِيْ لاَ يَجُوْرُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَقْضِ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهَا قَالَ لَهَا : كُوْنِيْ تُرَابًا ، فَتَصِيْرُ تُرَابًا . فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُوْلُ الْكَافِرُ : يَا لَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا ......

"কিয়ামাতের দিন দুনিয়ার সব প্রাণীকে (চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনর্জীবিত করা হবে এবং তাদের মাঝে) আল্লাহ তা'আলা এমন সুবিচার করবেন যে, তাদের কারো প্রতি ন্যূনতম কোন অবিচার করা হবে না। এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিং বিহীন জন্তুকে দুনিয়ায় আঘাত করে থাকলে এদিনে তার প্রতিশোধ তার নিকট থেকে নেয়া হবে (এবং এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে)। যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ সমাপ্ত হবে, তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করবেন: 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও'। এ আদেশের সংগে সংগে সব জন্তু মৃত্তিকা স্তুপে পরিণত হবে। এ সময় কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে: 'হায় আফসোস, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম'।[৫৮]

অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

"কিয়ামাতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনকি শিং বিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিং বিশিষ্ট ছাগলের নিকট থেকে নেয়া হবে"।[৫৯]

তাই এক্ষেত্রে বান্দাহর নিকট দায়বদ্ধতা আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধতার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়াবহ। কেননা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াও সহজ এবং

---

[৫৭] আল-কোরআন: সূরা আল-আন'আম, ৬:৩৮

[৫৮] ইবন কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল, তাফসীরুল কোরআনিল 'আযীম (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ, মু. ৩, ১৪০৯ হি.), খ. ৪, পৃ. ৪৯৭

[৫৯] প্রাগুক্ত।

ক্ষমা পাওয়ারও নিশ্চয়তা আছে। কোন মানুষ পাহাড়সম পাপ করেও যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। এর জন্য তাকে বিশেষ কোন সময় অথবা বিশেষ কোন স্থান বেছে নিতে হয়না। বিশেষ কোন ব্যক্তির ওসীলাও ধরতে হয়না। কিংবা আল্লাহর আরশে গিয়ে ধরনা দেয়ার জন্য বিশেষ কোন বাহনেরও সহযোগিতা নিতে হয়না। বরং পাপটির ব্যাপারে নিজের মধ্যে অনুভূতি আসা মাত্রই সে নিজের অবস্থানে থেকে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে আর না করার অংগীকার করলেই তিনি তা ক্ষমা করে দেন।

পক্ষান্তরে এক বান্দাহর সাথে অপর বান্দাহর হকের কোন হেরফের হলে অথবা একের সাথে অপরের মনোমালিন্যের কোন কারণ ঘটলে তা শুধরানো খুবই কষ্টসাধ্য। কেননা, মানুষেরা স্বভাবগতভাবেই একে অপরের কাছে নত হতে চায়না। তাই নিজের ভুল উপলব্ধি করে তার জন্য অপর ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইতে তাদের একটু সময় লাগে। তাছাড়া কোন কারণে ক্ষমা চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়াই অনেক সময় দু:সাধ্য হয়ে উঠে। আবার খুঁজে পাওয়ার পরও সে ব্যক্তি তাকে সত্যি সত্যি ক্ষমা করে দেবে এমন কোন গ্যারান্টিও নেই। উদাহরণ স্বরূপ- কোন ব্যক্তি যানবাহনে চলতে গিয়ে দুই মাস আগে কোন এক চালককে ভাড়া না দিয়েই কেটে পড়েছিল। কিন্তু আজ তার অনুভব হচ্ছে যে, আমি ঐ চালককে ঠকিয়েছি, তার হক নষ্ট করেছি এবং এটা করা আমার উচিত হয়নি। অথবা কোন ব্যক্তি ভাড়া না মিটিয়েই হয়ত রিক্সাচালককে নিয়ে নিজের বাসার আঙ্গিনায় চলে এসেছে। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে বেচারা চালক অতিরিক্ত ভাড়া দাবী করায় খানিকটা বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে হয়ত গায়ের জোরে তাকে দু'টো চড় বসিয়ে দিয়েছে। এবং রাগের মাথায় কোন ভাড়া না দিয়েই বাসায় চলে গিয়েছে। এমতাবস্থায় এখন শত চেষ্টা করেও হয়ত আর সেই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। অথবা একান্ত পাওয়া গেলেও তার কাছ থেকে সত্যিকার ক্ষমা পাওয়ার কোনই নিশ্চয়তা নেই। এই হলো বান্দাহর হক তথা মু'আমালাতের অবস্থা। অথচ যুগ যুগ ধরে কুফর, শিরক ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত থাকার পরও যদি কেউ যথার্থ অর্থে আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে পারে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। এবং আল্লাহর কাছে এত বড় পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার বেলায়ও কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতা, কোন লিখিত আবেদন, কারো মধ্যস্থতা ধরা, কোন বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গীতে বা বিশেষ নিয়মে ক্ষমা চাওয়ারও প্রয়োজন নেই। বরং নিজের অবস্থানে থেকেই

কৃতকর্মের জন্য অনুশোচিত হয়ে, এর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো তা না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেই আল্লাহ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করে দেন। এ দিক থেকে 'ইবাদাতের চেয়েও মু'আমালাতের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহর হকের ন্যায় বান্দাহর হকের ব্যাপারেও তাই আমাদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত।

'ইবাদাতের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা আরোপ করা অবৈধ:

কোন 'ইবাদাত সম্পাদিত হয় দাসের পক্ষ থেকে তার মনিবের উদ্দেশ্যে। মানুষ আল্লাহর দাস বিধায় সে তার মনিব আল্লাহর উদ্দেশ্যে তার 'ইবাদাত সম্পাদন করে। এক্ষেত্রে দাস ও মনিবের মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করার প্রয়োজন নেই। দাস নিজেই অবহিত যে, সে কার দাস? কী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য? মনিবের প্রতি তার কী দায়বদ্ধতা রয়েছে? তার প্রতি তিনি কী কী অনুগ্রহ প্রদান করেছেন? এবং তিনি সকল কিছুই করতে সক্ষম। তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষীও নন। আবার মনিবও জানেন যে, এই দাস তাঁর প্রতি কত অসহায়। কেন সে তাঁর অনুগত? তিনি ছাড়া কেউ তার সহায় নয়। তিনিই কেবল তাকে যা প্রয়োজন তা দিতে পারেন। এবং তিনি তাকে কিছু দিতে চাইলে কেউ বারণ করার ক্ষমতা রাখেনা, বা কারো সুপারিশেরও প্রয়োজন পড়েনা। এমনকি তিনি না দিতে চাইলে কেউ তাঁকে তা দিতে বাধ্যও করতে পারে না। অতএব 'ইবাদাতের বেলায় মধ্যস্থতা আরোপের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বান্দাদের আকুতি তিনি তাদের অতি নিকটে থেকেই শ্রবণ করেন। আল-কোরআনে তিনি এ প্রসংগে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন:

(وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ)

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, তাও আমি অবগত। এবং আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।"[৬০]

একবার সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে বললেন: আমাদের প্রভু কি আমাদের খুব নিকটে? তাহলে আমরা চুপিসারে তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলবো, নাকি তিনি অনেক দূরে? তাহলে আমরা তাঁকে জোরে

---

[৬০] আল-কোরআন: সূরা কাফ, ৫০:১৬

আওয়াজ করে ডাকবো। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দেয়া হলো যে, তিনি বান্দার অতি নিকটে। ইরশাদ হয়েছেঃ

(وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّـــيْ فَإِنِّـــيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْـــوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْـــيَسْـــتَجِيْـــبُوْا لِيْ وَلْـــيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ)

“(ওহে রাসূল) আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, তাহলে (আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে,) আমি অতিশয় নিকটে। আমি কোন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। তাই তাদের উচিত, তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে। (এ কথা আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন) হয়ত তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।”[৬১]

উল্লেখ্য যে, কোরআন শরীফের আরো বিভিন্ন জায়গায় মহান আল্লাহ এই ভঙ্গিতে কথা বলেছেন। কিন্তু সর্বত্রই তিনি উত্তরটা জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর নবীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমার বান্দারা যদি আপনাকে অমুক অমুক বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, এটির জবাব এই, কিংবা এটির সমাধান এই[৬২] --------- ইত্যাদি। অথচ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তিনি নিজেই তাঁর অবস্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি অতি নিকট থেকে তাঁর বান্দাহর আকুতি শুনে থাকেন এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তাকেও তিনি নাকচ করে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ‘ইবাদাতে মধ্যস্থতা আরোপ করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজের এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী নিরূপণ করল, সে সর্বসম্মত মতে শিরক করল। এ শ্রেণীর মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাসের কথা জানিয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ

(مَا نَـــعْـــبُدُهُمْ إِلاَّ لِـــيُقَـــرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى)

---

[৬১] আল-কোরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৬

[৬২] আল-কোরআনঃ সূরা- (২:১৮৯, ২১৭, ২১৯, ২২০, ২২২, ৭: ১৮৭, ৮:১, ১৭:৮৫, ১৮:৮৩, ২০:১০৫, ৭৯:৪২)

"(মক্কার কাফিররা বলে) আমরা তাদের 'ইবাদাত এজন্যেই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"[৬৩]

এখানে মক্কার কাফিরদের কথা বিবৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সব কাফির মুশরিকদের একই অবস্থা। এক আল্লাহকে তারা সবাই স্বীকার করে। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহর দরবার অনেক উঁচু। তাদের পক্ষে সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়; তাই তারা এসব সত্তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যত্র তাদের অবস্থা জানিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

(وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَنْفَعُهُمْ وَ لاَ يَضُرُّهُمْ)

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর 'ইবাদাত করে, যা তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না।"[৬৪]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)

"তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে ঐ দীন তথা বিধি-বিধান প্রচলন করেছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নি?"[৬৫]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, এসব শরীক দেবতার কথা সকল আয়াতেই বহুবচনে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এজন্যে যে, শিরকের ব্যাপারে কখনোই কোন ঐকমত্য হতে পারে না; ঐকমত্য কেবল তাওহীদের ব্যাপারেই সম্ভব। তাই তো দেখা যায় যে, কেউ একজনকে দেবতা মানছে, আবার কেউ অন্যজনকে। কেউ গ্রহ-তারার পূজা করছে, কেউবা মৃত মহাপুরুষদের। কেউ বিশেষ কোন ব্যক্তি, বিশেষ কোন মাজারকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় মনে করছে, আবার কেউ মনে করছে অন্য কাউকে। কেননা তাদের এই ধারণা কিংবা ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি কোন বিশেষ জ্ঞান অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়নি; বরং এসবই তো অন্ধ ভক্তি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও মনগড়া চিন্তা-চেতনারই বহি:প্রকাশ মাত্র।

পবিত্র কোরআনে মহান রাব্বুল 'আলামীন কোন প্রকার শরীক কিংবা মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই কেবল তাঁর 'ইবাদাত করার জন্য আমাদেরকে আদেশ

---

[৬৩] আল-কোরআনঃ সূরা আয্-যুমার, ৩৯:৩
[৬৪] আল-কোরআনঃ সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৫৫
[৬৫] আল-কোরআনঃ সূরা আশ্-শূরা, ৪২:২১

করেছেন। এবং তিনি সরাসরি তাঁরই কাছে চাওয়া বা প্রার্থনা করারও উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ)

“আর তোমাদের পালনকর্তা বলেন: তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব। যারা আমার ‘ইবাদাতের ব্যাপারে অহংকার করে, তারা সত্বরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।”[৬৬]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন:

(اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ)

“তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।”[৬৭]

এ প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ ، حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ ، فَيَقُوْلُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَنَا الْمَلِكُ . مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ فَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيْءَ الْفَجْرُ .

“যখন প্রত্যেক রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: আমি মহারাজ, আমি মহারাজ। ওহে! কে আছ, যে আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাবে! আমি তাকে তা দিয়ে

---

৬৬. আল-কোরআন: সূরা গাফির, ৪০:৬০

৬৭. আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৫

দেব? কে আছ, যে আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাবে। আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। অত:পর ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে"।[৬৮]

জাবির (রা.) সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً ، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْــيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَ ذَلِكَ كُلَّ لَــيْلَةٍ .

"আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই রাতে একটি সময় রয়েছে, যাতে কোন মুসলিম আল্লাহর কাছে দুনিয়া এবং আখিরাতের যে কল্যাণই চাবে, তিনি তাকে তাই দেন। আর এমনটি প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে"।[৬৯]

সুতরাং 'ইবাদাতের বেলায় আল্লাহর সাথে কোন মধ্যস্থতা আরোপ করার প্রয়োজন নেই, বরং সরাসরি আপন প্রভুর কাছে চাইলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। এবং তিনি বান্দাহর ডাকে সাড়া দেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবী মু'আয ইবন জাবাল (রা.) কে নসীহত করেছিলেন এ কথা বলে-

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَ إِذَا اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِاللهِ .

"তুমি যখন কোন কিছু চাইবে আল্লাহর কাছেই চাও। আর যদি কারো কাছে সাহায্য কামনা কর তাহলে আল্লাহর সাহায্যই কামনা কর"।[৭০] সুতরাং মাঝখানে আর কারো সহযোগিতা নেয়া উত্তম হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা-ই শিখাতেন। মধ্যস্থতা আরোপের কোন আবশ্যকতা থেকে থাকলে অথবা এর কোন সুযোগ থাকলে অবশ্যই তিনি তা বলে দিতেন। বিশেষ করে তিনি নিজে আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুবাদে তাঁকেই মধ্যখানে স্থাপনের দীক্ষা দিতেন।

---

[৬৮] মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন, মুখতাসারু সহীহি মুসলিম (মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী সম্পাদিত), (বৈরূত: আলমাকতাবুল ইসলামী, মু. ৭, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-১৮৮০

[৬৯] প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৭৯

[৭০] জামি' আত্-তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫১৬

মধ্যস্থতা বা 'ওসীলা'র অর্থ ও এর তাৎপর্য:

'ওসীলা' (وَسِيْلَةٌ) আরবী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ হলো Medium বা মাধ্যম। শব্দটি (وَسَلَ) ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এখান থেকেই উৎপত্তি হলো আরবী শব্দ (اَلتَّوَسُّلُ) এর। যার শাব্দিক অর্থ হলো মধ্যস্থতা আরোপ করা বা মাধ্যম বানানো। সাধারণভাবে কোন লক্ষ্য হাসিল বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যা কিছুর দ্বারস্থ হওয়া হয়, তাকেই 'ওসীলা' বলে। যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু উভয়ই এরূপ 'ওসীলা' হতে পারে। যেমন- আপনার ভাইয়ের ছেলে আপনার পুত্রতুল্য এবং আপনি তার পিতৃতুল্য। তার বাবা আপনার ভাই হওয়ার সুবাদে সে আপনার কাছ থেকে পিতৃস্নেহ আশা করে। আপনার সামনে সে কোন সমস্যাগ্রস্ত হলে অন্য কারো শরণাপন্ন না হয়ে সে আপনারই শরণাপন্ন হয়। আপনার কাছে তার এ দাবীর পেছনে তার বাবা তথা আপনার ভাই হলেন ওসীলা। তেমনিভাবে আপনার অধীনে কেউ চাকরী করলে মাস শেষে সে আপনার কাছে বেতন চাবে, অন্য কারো কাছে নয়। আপনি তাকে বেতন দিতে গড়িমসি করলে প্রয়োজনে সে আইনের আশ্রয় নেবে আপনার বিরুদ্ধে, অন্য কারো বিরুদ্ধে নয়। কেননা আপনি তার সাথে চুক্তিবদ্ধ। সে আপনাকে নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে সময় ও শ্রম দিয়েছে। সুতরাং এই চুক্তি, সময় ও শ্রম এখানে আপনার কাছে তার দাবী দাওয়ার পেছনে ওসীলা।

আমরা সকলেই আল্লাহর দাস। আর তিনি আমাদের সকলেরই মনিব। আমাদের কাজ হলো তাঁর দাসত্ব করা। আর তাঁর কাজ হলো আমাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করা। সুতরাং আমাদের ভেতর থেকে যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে তারা তাঁর কাছ থেকে দাসত্ব করার বিনিময়ে পুরস্কার পাওয়ার হকদার। তাই এ শ্রেণীর দাসদেরকে পুরস্কৃত করবেন বলে তিনি ওয়াদাও করেছেন। পক্ষান্তরে যারা দাস হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাসত্বের বিধান মেনে চলে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর এ সূত্র ধরেই আমরা (আল্লাহর মু'মিন বান্দারা) তাঁর কোন আদেশ পালনের পর পরই তাঁর কাছে চাইতে শুরু করি। অর্থাৎ তাঁর আদেশ পালনকে আমরা তাঁর কাছে আমাদের চাওয়ার পেছনে ওসীলা মনে করি। যেমন, ফরয সালাত আদায়ের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত যেসব দু'আ পড়তেন এবং উম্মাতদেরকেও যা পড়তে বলেছেন- তা সবই এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস শরীফে ওসীলা শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহার হয়েছে। আর তা হলো- এটি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরের নাম। যার উপরে আর কোন স্তর নেই। এটি আল্লাহর

আরশের অধিক নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্তর প্রাপ্তির জন্য কামনা করতেন। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوْا لِي الْوَسِيْلَةَ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! وَ مَا الْوَسِيْلَةُ ؟ قَالَ : أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ .

"তোমরা যখন আমার উপর দরূদ পড়, তখন আমার জন্য ওসীলার দু'আ কর। জিজ্ঞেস করা হলো, ওহে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! ওসীলা কি? তিনি বললেন: জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর, যা কেবল একজন মানুষই পাবে। আমি চাই যে, যেন আমিই সেই মানুষটি হই।"[৭১]

অপর এক হাদীসে 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا لِيْ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيْ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ .

"তোমরা মুআযি্যনকে আযান দিতে শুনলে সে যা বলে তোমরাও তাই বল। এরপর আমার উপর দরূদ প্রেরণ কর। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলার দু'আ কর। কেননা এটি জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা, যা আল্লাহর বান্দাদের ভেতর থেকে কেবল একজন বান্দাই পাবে। আমি চাই যেন আমিই সেই বান্দাটি হই। যে আমার জন্য এই ওসীলা প্রাপ্তির দু'আ করবে, সে আমার শাফা'আত প্রাপ্ত হবে।"[৭২]

---

[৭১] মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-৭৫৮৮

[৭২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৩৮৪

আরেক হাদীসে জাবির (রা.) বলেন:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا اَلَّذِيْ وَعَدْتَهُ – إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে- হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দান কর জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ও সুমহান মর্যাদা। আর তাঁকে অধিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে, যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে করেছ। - কিয়ামাত দিবসে নিশ্চয় সে শাফা'আত প্রাপ্ত হবে।"[৭৩]

কোন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ অথবা অন্য কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কাছে কোন সাধারণ নাগরিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যেতে চাইলে এমন কারো মধ্যস্থতা খোঁজেন, যিনি তাঁর কাছে পরিচিত এবং তাঁর নিকট বিশ্বস্ত। এরূপ মধ্যস্থতা ছাড়া দুনিয়ার কর্তা ব্যক্তিদের মনও গলে না; আর মানুষের কার্যসিদ্ধিও হয় না। তাছাড়া নিজের প্রয়োজনের কথা না জানালে দুনিয়ার রাজা বাদশাহগণ তাদের প্রজাদের মনের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা জানতেও পারেন না। পক্ষান্তরে মহা রাজাধিরাজ আল্লাহর কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তাঁর বান্দাদের আবেগ, অনুভূতি, চাহিদা ও প্রয়োজন ইত্যাদি সবই সম্যকরূপে অবগত। বান্দারা না চাইলেও তিনি তাদের সকল প্রয়োজনের কথা জানেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য কিংবা তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলার জন্য কোন ওসীলা বা মাধ্যমের দরকার আছে কিনা এবং থেকে থাকলে সেই ওসীলার প্রকৃত মর্ম কি তা জানা একান্ত আবশ্যক।

আল-কোরআনে বর্ণিত 'ওসীলা' অন্বেষণের প্রকৃত মর্ম:

আল-কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

---

[৭৩] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৬১৪ ও ৪৭১৯

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ)

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে পৌঁছার ব্যাপারে ওসীলা অন্বেষণ কর। আর তাঁর পথে সংগ্রাম সাধনা চালিয়ে যাও। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। নিশ্চয় যারা কাফির তারা যদি কিয়ামত দিবসের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এ দুনিয়ার সকল সম্পদ এবং তার সাথে এর সমপরিমাণ (অতিরিক্ত) সম্পদও বিনিময় দিতে চায়, তবুও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৭৪]

উক্ত আয়াতে ওসীলা বা মাধ্যম অবলম্বন করার যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তার প্রকৃত মর্ম কি? কেউ কেউ ধারণা করেন যে, আমরা দুর্বল, আমরা অক্ষম ও অসমর্থ। তাই নিজেদের এই দুর্বলতার কারণে কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে যথাযথভাবে চাইতে অক্ষম। অথবা আমাদের বিশাল পাপরাশির কারণে আমাদের চাওয়া অগ্রহণযোগ্য। আবার কেউ কেউ এ আয়াতের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিয়ে বসেন যে, পীর ধরা ফরয। অর্থাৎ পীরের মাধ্যম বা ওসীলা ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছা যায় না। কিন্তু এ সকল ধারণা মূলত: ভিত্তিহীন। কেননা, পাহাড়সম পাপ হয়ে গেলেও আল্লাহ আমাদেরকে নিরাশ হতে বারণ করেছেন। এবং একান্তে নিভৃতে তাঁরই কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছেন। মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর পাপাচারী বান্দাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন -

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . وَ أَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَ أَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ .)

"(হে নবী! আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিন যে,) হে আমার বান্দাহগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।

---

[৭৪] আল-কোরআন: সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৩৫-৩৬

নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর আর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না"।[৭৫]

মহান আল্লাহ এটা খুবই পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দারা কেবল তাঁরই অনুগত হোক, তাঁরই কাছে চাক। এবং এক্ষেত্রে কোন প্রকার মধ্যস্থতারও প্রয়োজন নেই। ওসীলা অন্বেষণ সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে কাতাদাহ (রা.) বলেন:[৭৬]

تَقَرَّبُوْا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ .

অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন কর। তথা ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। অন্য কথায়, যেসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা।

ওসীলা অন্বেষণ সংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাস্‌সিরীন হাফিয ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহ.) (মৃ. ৩১০ হি.) লিখেছেন:

أَجِيْبُوْا اللهَ فِيْمَا أَمَرَكُمْ وَ نَهَاكُمْ بالطَّاعَةِ لَهُ فِيْ ذَلِكَ ، وَ حَقِّقُوْا إِيْمَانَكُمْ وَ تَصْدِيْقَكُمْ رَبَّكُمْ وَ نَبِيَّكُمْ بِالصَّالِحِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، وَ اطْلُبُوْا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيْهِ .

আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো- "তোমরা তাঁর আদেশ এবং নিষেধগুলোকে যথাযথভাবে মেনে চল। এবং তোমরা যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী তা তোমাদের সৎ কার্যের মাধ্যমে প্রমাণ কর"। আর ওসীলা অন্বেষণের অর্থ হলো- "যে সব কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য তালাশ কর"।[৭৭]

হাফিয ইবন কাছীর (রহ.) বলেন:

---

[৭৫] আল-কোরআন: সূরা আয্-যুমার, ৩৯:৫৩-৫৪

[৭৬] ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ- ৫৫

[৭৭] আত্-তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আইল কোরআন (বৈরূতঃ মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১৫ হি.), খ. ৩, পৃ. ৮৮

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَيْ الْقُرْبَةَ . وَ كَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَ أَبُوْ وَائِلٍ وَ الْحَسَنُ وَ قَتَادَةُ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيْرٍ وَ السُّدِّيُّ وَ ابْنُ زَيْدٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَ هَذَا الَّذِيْ قَالَهُ هَؤُلاَءِ الْأَئِمَّةُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِيْنَ فِيْهِ . وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَسِيْلَةَ هِيَ الَّتِيْ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيْلِ الْمَقْصُوْدِ .

সুফিয়ান আছ্ ছাওরী (রহ.) ইবন 'আব্বাসের (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ওসীলার অর্থ হলো- কুরবাহ বা নৈকট্য। আর এই একই অর্থ সংকলিত হয়েছে মুজাহিদ, কাতাদাহ ও অপরাপর মুফাস্‌সিরীন থেকে। হাফিয ইবনু কাছীর (রহ.) আরো বলেন: এ সকল নেতৃস্থানীয় ইমামগণ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন এতে (নির্ভরযোগ্য) তাফসীরকারদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর তা হলো এই যে, ওসীলা হলো ঐ বিষয় যার মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছা যায়।[৭৮]

মোটকথা, আয়াতে উল্লেখিত ওসীলা অন্বেষণের যে নির্দেশ তা হলো 'আমলে সালেহ' বা সৎকর্ম। কেননা এটিই আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসেও আমরা এরই প্রমাণ পাই। তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করল, সে যেন তা দ্বারা (তিলাওয়াতের ওসীলা দিয়ে) আল্লাহর কাছে চায়"।[৭৯]

আবার আমলে সালেহ যতই করা হোক, ঈমান বিহীন তা মূল্যহীন। এ কারণেই যারা ঈমানদার তাদেরকে আমলে সালেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণের আদেশ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার নয়, তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য যত ফন্দী-ফিকির ও চেষ্টা-তদবীরই করুক, তা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের শুরুতে সূরা আল-ফাতিহায় মহান আল্লাহ আমাদেরকে ওসীলা অন্বেষণের এ প্রকৃষ্ট পন্থাই বাতলে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মুখ থেকে ঘোষণা করাচ্ছেন:

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ)

---

[৭৮] ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৭৯] ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

“আমরা কেবল তোমারই ‘ইবাদাত করি আর কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।”[৮০]

এখানে সাহায্য চাওয়ার আগে ‘ইবাদাতের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর একনিষ্ঠ দাসত্ব তথা শিরকমুক্ত ‘ইবাদাত হলো তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য ওসীলা, বা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। কাজ না করে কেবল চাওয়াকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। বরং তিনি চান যে, আমরা কাজ করি এবং তাঁর কাছে চাই। আর কাজ করার পর কেউ তাঁর কাছে চাইলে তিনি তাকে দেয়ার ব্যাপারেও অঙ্গীকারবদ্ধ। আল-কোরআনের অন্যত্র তাই ইরশাদ হয়েছে:

(وَ قُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَ سَتُرَدُّوْنَ
إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ)

“(হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, তোমরা আমল কর। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ প্রত্যক্ষ করবেন তোমাদের কাজ। এরপর তোমাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু জানেন। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন, তোমরা কেমন আমল করছিলে”।[৮১]

উপরোক্ত এ আয়াত থেকে আরেকটি বিষয়ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তা হলো- ঈমান আনার পর আমলে সালেহ করতে থাকা একজন মু'মিনের কাজ। আর সে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণের কাজ। ভাল কাজের যথার্থ মূল্যায়ন পাওয়া মু'মিনের ন্যায্য অধিকার। এ অধিকার তাকে চাইতে হবে না। এমনিতেই সে তা পাবে। বিশেষ করে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ভাল কাজের স্বীকৃতি দাবী করে আদায় করতে হয় না। তিনি নিজেই তাঁর বান্দার প্রতিটি ভাল কাজের পূংখানুপুংখ হিসেব রাখেন এবং নিজ দায়িত্বেই তিনি তাকে এর বিনিময়ে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করবেন। আয়াতের শেষাংশে সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকাশ্য ও গোপন দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু যে মহান স্রষ্টা জানেন তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্মের কথা জানাবেন।

এমনিভাবে আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

---

[৮০] আল-কোরআন: সূরা আল-ফাতিহা, ১:৪

[৮১] আল-কোরআন: সূরা আত্-তাওবাহ, ৯:১০৫

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوْا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ)

"জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজা খুলে দেব। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে তাদের এই কর্মকান্ডের বিনিময়ে আমি তাদেরকে পাকড়াও করব।"[৮২]

অন্য আয়াতে মু'মিনদেরকে আদেশ করে মহান আল্লাহ্ বলছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন"।[৮৩]

আরেক আয়াতে আহ্লে কিতাবদেরকেও ঈমান এবং তাকওয়ার শর্ত জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে:

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ
لَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمَ)

"আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, আমি অবশ্যই তাদের পাপরাজি মোচন করে দেব এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।"[৮৪]

তাছাড়া ঈমানের ওসীলা দিয়ে মু'মিনদের ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে আল্লাহ নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

(اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

"যারা (তাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে) বলেঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদের পাপরাজিকে ক্ষমা কর। এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"[৮৫]

---

৮২. আল-কোরআনঃ সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯৬
৮৩. আল-কোরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৩
৮৪. আল-কোরআনঃ সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৬৫
৮৫. আল-কোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৬

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন:

(رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ آمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ)

"হে প্রভু! আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, যে বলছিল: তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তারপর আমরা তার দাওয়াত কবুল করেছি। সুতরাং হে আমাদের রব! আমাদের যা অপরাধ হয়েছে তা মাফ কর, যেসব দোষ-ত্রুটি আমাদের মধ্যে রয়েছে তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের মউতের মতো আমাদের মৃত্যু দাও।"[৮৬]

উক্ত আয়াতে এবং এ জাতীয় আরো কোন কোন আয়াতে পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য ঈমানকেই প্রধান ওসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এবং আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা ঈমানের ওসীলা দিয়ে তাঁর কাছে চেয়েছেন, তাদের গুণকীর্তন করে তিনি নিজেই এর বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব, ঈমান এবং আমলে সালেহ্ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করতে হবে। এভাবে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনার চেষ্টা করাই হলো ওসীলা অন্বেষণের প্রকৃত মর্ম।

মহান আল্লাহ্‌ই হলেন একমাত্র ত্রাণকর্তা:

মহান আল্লাহ্‌ই হলেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য একমাত্র ত্রাণকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কাউকে বিপদে সাহায্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, সংকটপূর্ণ অবস্থায় ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা এরূপ ধারণা পোষণ করাও সুস্পষ্ট শিরক। আল-কোরআনের অনেক জায়গায় মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক বানানো হয় তাদের কারোরই উপকার করার কিংবা ক্ষতি থেকে বাঁচানোর কোনই ক্ষমতা নেই। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন:

(وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَ لاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ)

---

[৮৬] আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৯৩

"তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাক তারা (তোমাদের) সাহায্য তো করতেই পারেনা, নিজেদের সাহায্যও তারা করতে পারেনা"।[৮৭] অন্যত্র তিনি বলেছেন:

(قُلْ أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعاً)

"(হে নবী!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কারো 'ইবাদাত করবে যে তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণের ক্ষমতা রাখে না?"[৮৮]

এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের সামান্য প্রয়োজনের কথাও মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে বলেছেন। এমনকি একজন মু'মিন যেন তার জুতার ফিতার প্রয়োজনও মহান আল্লাহর কাছেই বলে। আর তাই জাগতিক কোন বিষয়ে নিজের বন্ধু-বান্ধব, অভিভাবক, দায়িত্বশীল বা অন্য কারো কাছে কিছু চাইলেও এ বিশ্বাস নিয়ে চাইতে হবে যে, তিনি নিজে তা আমাকে দিতে সক্ষম নন যদি আল্লাহ তাকে দিয়ে তা না করান। আল্লাহ তাকে তাওফীক দিলেই তিনি আমাকে দিতে পারেন, অন্যথায় নহে। এবং আল্লাহ তার মনকে এ ব্যাপারে সম্মত বানালেই তিনি আমার আবদার রক্ষা করবেন, অন্যথায় নহে। সর্বোপরি আমাদেরকে এ বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না।

তাছাড়া আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের উপাসনা করা হয়, কিংবা সাহায্য চাওয়া হয় তারা কেউই স্রষ্টা নয়, সৃষ্টি। সক্ষম নয়, অক্ষম। অমুখাপেক্ষী নয়, মুখাপেক্ষী। এমনকি তারা এতই দুর্বল যে, তারা নিজেরা নিজেদেরও কোন কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখেনা। এবং অন্যের অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে দেয়া মহান আল্লাহর দৃষ্টান্ত কতইনা চমৎকার। তিনি বলেছেন:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ، إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ، وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ)

---

[৮৭] আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৯৭

[৮৮] আল-কোরআন: সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৭৬

"হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও এর জন্য তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন।"[৮৯]

শুধু তাই নয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে চাইলে তারা তা শুনেও না এবং এর জবাবও দিতে পারেনা। এমনকি তাদেরকে নিয়ে মানুষদের এসব আচরণকে তারা পরকালে স্বীকারও করবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

(إِنْ تَدْعُوْ هُمْ لاَ يَسْـــمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْـــتَجَابُوْا لَكُمْ وَ
يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْـــفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلاَ يُنَـــبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْـــرٍ)

"তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনেনা। আর শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়না। এবং কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। বস্তুত: আল্লাহর ন্যায় তোমাকে আর কেউ অবহিত করতে পারবে না"।[৯০]

এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাইলে কিংবা তাকে ওসীলা ধরলে সে কিছুই করতে পারেনা। এবং এটি পরিষ্কার শিরক।

অতএব, যে মহান স্রষ্টা সর্বশক্তিমান, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং যিনি তাঁর সৃষ্টির কল্যাণে সব কিছুর যথাযথ ব্যবস্থা করে থাকেন, তিনিই কেবল 'ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত, আর কেউ নন। তাঁরই সামনে মাথা নত করা যাবে, আর কারো সামনে নয়। কেবল তাঁরই বিধান অনুসরণ করতে হবে, অন্য কারো বিধান নয়। তাছাড়া যিনি প্রকৃত মা'বূদ তাঁর কাছে চাওয়াও একটি 'ইবাদাত। এবং এই 'ইবাদাতে অন্য কোন সৃষ্টিকে মধ্যস্থতাকারী হওয়ার যোগ্য বলে মনে করা কিংবা অন্য কারো মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা সুস্পষ্ট শিরক। এতে আসল মা'বূদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় এবং বান্দাহদের প্রতি তাঁর অনাবিল দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানানো হয়।

---

[৮৯] আল-কোরআন: সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৭৩

[৯০] আল-কোরআন: সূরা ফাতির, ৩৫: ১৪

মানুষেরা একে অন্যের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে নাঃ

সৃষ্টিগতভাবে মানুষেরা সকলেই সমান। তাদেরকে একে অপরের সহযোগী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কেউ অন্যের উপর প্রভুত্ব করার অধিকার রাখে না। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কেউ কারো উপকার বা ক্ষতি সাধনও করতে সক্ষম নয়। এমনকি মানুষদের মধ্যে যাঁরা নবী বা রাসূল হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদেরও এই ক্ষমতা নেই যে, তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে অন্য মানুষদের উপকার কিংবা ক্ষতি করবেন। অথবা তাঁদের নিজেদের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধন করে ফেলবেন। নবীর অনুসারীরা তাঁর ব্যাপারে এরূপ ধারণা করেও বসতে পারে বিধায় মহান আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়েই উম্মাতকে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে-

(قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إلاَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إلاَّ
نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ)

"(হে নবী) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে আমি আমার নিজেরও কোন উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারি না। আর যদি আমি গায়েবের খবর জানতাম তাহলে বেশি বেশি করে কল্যাণ কুড়িয়ে নিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো কেবল বিশ্বাসী সম্পদায়ের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা মাত্র"।[৯১]

মহান আল্লাহ নবীর মুখ দিয়ে আরো ঘোষণা করিয়েছেন যেঃ

(قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُوْلُ
لَكُمْ إِنِّيْ مَلَكٌ)

"(হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)!) তাদের বলে দিন, আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনাগার আছে। আর আমি গায়েবও জানি না। এবং আমি তোমাদের একথাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা"।[৯২]

---

[৯১] আল-কোরআনঃ সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ১৮৮

[৯২] আল-কোরআনঃ সূরা আল-আন'আম, ৬ : ৫০

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত নন। অদেখা বিষয় বা ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনি কেবল ততটুকুই জানতেন যতটুকু তাঁকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। যেমনটি তাঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে -

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ : لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ .

"সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি খায়বারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, (আগামীকাল) আমি যুদ্ধের ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন"।[৯৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আলী (রা.) কোথায় জানতে চান। সাহাবীরা হযরত 'আলীর সন্ধান দিলে তিনি তাকে ডেকে এনে এ যুদ্ধের ঝান্ডা তার হাতে তুলে দেন। এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সত্যি সত্যি 'আলী (রা.) এর হাতে খায়বারের বিজয় হয়। এ ঘটনা ছাড়াও রোম ও পারস্যের বিজয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বাভাস সহ আরো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয় মহান আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন ভবিষ্যতের ব্যাপারে তিনি কেবল সেগুলোই জানতেন। কিন্তু সাধারণভাবে সকল গায়েবের খবর তাঁর কাছে ছিল না।

সুতরাং সাধারণভাবে মানুষেরা যেহেতু নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণেরও ক্ষমতা রাখে না, তাই অপর মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণও তাদের কর্তৃত্বাধীন হতে পারেনা। হ্যাঁ অপর মুসলিমের জন্য কেউ মহান আল্লাহর কাছে কোন কিছুর জন্য দু'আ করতে পারে, যাকে আমরা সুপারিশ বলে অভিহিত করি। এরূপ সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে এ সুপারিশ করার ক্ষমতাও নি:শ্বেষিত হয়ে যায় যখন সে ব্যক্তিটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরবর্তীতে কিয়ামাতের ময়দানে আল্লাহর সৎ বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে তিনি চান আবার সুপারিশ করার ক্ষমতা অর্পণ করবেন। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে দু'আ চাইতেন। এবং তিনিও তাদের জন্য দু'আ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর

---

[৯৩] আল-লু'লু' ওয়াল মারজান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭২৯, হাদীস নং- ১৫৫৭

সাহাবায়ে কিরাম তাঁর বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছে এমনিভাবে দু'আ চাইতেন। এবং তাঁরাও তাদের জন্য তাদের কাংখিত বিষয়ে দু'আ করতেন। তাই বলে কোন পাপিষ্ঠ নাফরমান তাঁদের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর শাস্তি থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে এটা হতে পারে না।

নবী কিংবা সাহাবীদের ওসীলায় দু'আ করার প্রকৃত মর্মঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীগণ তাঁর ওসীলায় দু'আ করতেন। পরবর্তীতে সাহাবীগণ তাঁদের নিজেদের ভেতর যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক প্রিয়পাত্র কিংবা তাঁর আত্মীয়, তাঁদের দোহাই দিয়েও মহান আল্লাহর কাছে চাইতেন। কিন্তু এরূপ ওসীলা ধরার প্রকৃত মর্ম কি? আজও কি যে কেউ তাঁদের ওসীলা দিয়ে দু'আ করলেই সফলকাম হয়ে যাবে? নবী কিংবা সাহাবীদের ওসীলায় দু'আ করার প্রকৃত মর্ম হলো তাঁদের আদর্শের অনুসারী হওয়ার দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া। কেননা আমি কোন মানুষের দোহাই দিতে পারব তখনই যখন তার সাথে আমার সম্পর্ক থাকে, এবং আমি তার প্রিয়পাত্র হই। কিংবা যার কাছে আমি কোন কিছু চাচ্ছি তিনি যদি তার প্রিয়পাত্র হন, তার কথা যদি তিনি ফেলতে না পারেন। কিন্তু যার সাথে আমার বৈরী ভাব বিদ্যমান, যাকে আমি পছন্দ করিনা, অথবা আমি যার কাছে চাচ্ছি তিনি যাকে পছন্দ করেন না এমন কারো ওসীলা ধরা যেমনি অবাঞ্ছিত, তেমনি তার ওসীলায় কোন সুবিধাপ্রাপ্ত হওয়াও অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ- 'ক' যদি 'খ' এর বন্ধু হয়। আর 'গ' যদি তাদের কোন একজনের পরিচিত এবং প্রিয়পাত্র হয়, তাহলে এই একজনের দোহাই দিয়ে অপরজন থেকে 'গ' কিছু পাওয়ার আশা করা খুবই সংগত। কিন্তু 'গ' যদি তাদের কোন একজনেরও পরিচিত কিংবা প্রিয়পাত্র না হয়, তাহলে তাদের দুইজনের কারো কাছেই তার চাওয়া বা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ভেতর থেকে কারোই দোহাই দিয়ে লাভ নেই। বরং এক্ষেত্রে তাদের কারো ওসীলা ধরা বা না ধরা উভয়ই সমান। অবশ্য কারো ওসীলা ছাড়াই সে তাদের যে কোন একজনের কাছে কোন কিছু চাইলে চাইতে পারে এবং তিনিও তাকে দিলে দিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমরা যারা অনুসারী তারা তাঁকে অনুসরণের ওসীলা দিয়ে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু মহান আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইতে পারি। কিন্তু যারা তাঁর আদর্শের অনুসারী নয় কিংবা তাঁর আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা কোন্ যুক্তিতে তাঁর ওসীলায় তাঁরই বন্ধুর কাছে কিছু চাইবে? আর এরূপ ওসীলা ধরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়ার যদি

কোন যৌক্তিকতা কিংবা বৈধতা থাকত, তাহলে মক্কার ঐসব কাফিররা তাঁর দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে রেহাই পাওয়ার বেশি উপযুক্ত হত, যারা ছিল তাঁরই পরিবারভুক্ত, তাঁরই আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই যাদের ছিল খুবই সখ্যতা এবং তাঁর ব্যাপারে তাদের ছিল অত্যন্ত সুধারণা। যাদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদর-যত্ন করে বড়ও করেছে। যারা সুখে-দু:খে সর্বদাই তাঁর সাথে ছিল। কিন্তু পরক্ষণে তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর তিনি তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন।

অতএব, দু'আ করার সময় আমরা মুখে কারো ওসীলার কথা বলি বা না বলি সেটি বড় কথা নয়। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদাংক অনুসরণকারী হয়ে থাকি, তাহলেই আল্লাহর কাছে আমাদের চাওয়া গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর কোন সাহাবী অথবা তাঁদের কোন সঠিক অনুসারীর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে দু'আ চাইতে যাওয়ায় কোন বাধা নেই। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর আর তাঁদের মাযারে গিয়ে দু'আ করার আলাদা কোন ফযীলত বা বৈশিষ্ট্য নেই। বরং তাঁদের আদর্শের যথাযথ অনুসরণই পরবর্তীকালে তাঁদের ওসীলা ধরার প্রকৃত ও সঠিক পন্থা। অর্থাৎ তাঁদের অনুসৃত পথে চলে যে কেউ মহান আল্লাহর কাছে চাইতে পারবে। এবং এভাবে চাওয়া আল্লাহ তা'আলা নিজেই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সূরা আল-ফাতিহায় তিনি যে আমাদেরকে তাঁর কাছে সোজা পথের দিশা চাইতে বলেছেন, সেখানে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে তোমরা আমার কাছে ঐ সোজা পথটি চাও যেপথে চললে আমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাহ হওয়া যায়। তাদের পথ চেয়ো না যাদের উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে[৯৪]। এখান থেকে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর প্রিয়পাত্রদের দোহাই দিয়ে তাঁর কাছে কিছু চাওয়া যায়। আর যাঁরা সফলকাম যাঁরা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ তাঁদের অনুকরণ যেমন করতে হবে, তাঁদের পথে চলার জন্য আল্লাহর কাছে তৌফিকও কামনা করতে হবে। এ পথ আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ। এ পথে চলা 'ইবাদাত তথা আমলে সালেহ। তাই এ পথে চলার ওসীলায় আল্লাহর কাছে চাওয়া যাবে। কেননা ঈমান ও আমলে সালেহের ওসীলায় আল্লাহর কাছে চাইতে বলা হয়েছে।

---

[৯৪] আল-কোরআন: সূরা আল-ফাতিহা, ১: ৬-৭

ওসীলার প্রচলিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে ব্যক্তিপূজার দ্বার উন্মোচিত হয়:

আমাদের সমাজের একশ্রেণীর মানুষের কাছে ওসীলার বহুল প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো- ওসীলা মানে পীর ধরা। কাউকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে মান্য করা। তারা ধর্মীয় ব্যাপারে সেই গুরু বা পীরের কথাই মেনে চলাকে আবশ্যক বলে ধারণা করে। এবং তাঁর দেখানো পন্থা ব্যতীত আল্লাহর 'ইবাদাতও গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনুমান করে। এই শ্রেণীর লোকদের মতে যার পীর নাই তার পীর হলো শয়তান। অর্থাৎ তথাকথিত পীরের হাতে বাই'আত হওয়া তাদের দৃষ্টিতে ফরয। পীর বিহীন নিজে নিজে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা এবং আল্লাহর কাছে চাওয়াকে তারা অসম্ভব এবং নিষ্ফল মনে করে। শুধু তাই নয়, পীরের হাতে বাই'আত না হয়ে মৃত্যু বরণ করাকে তারা জাহিলিয়াতের মৃত্যু বলে শুমার করে।

এমনকি দেখা যায় যে, এক এক এলাকার তথাকথিত ধর্মগুরু তাঁর নিজের ভক্ত অনুসারীদের জন্য 'ইবাদাতের বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেন। ফলে অশিক্ষিত কিংবা অল্প শিক্ষিত তাঁর ঐসব ভক্ত অনুরক্তরা তাঁর পদাংক অনুসরণ করতে থাকে। এবং একমাত্র ঐ পন্থারই অনুকরণকে তারা নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে মনে করে নেয়। আর কাউকে অন্য কোন পন্থা অনুকরণ করতে দেখলে কখনো বা তারা মারমুখী পর্যন্ত হয়ে উঠে। কেননা তাদের দৃষ্টিতে কেবল ঐ ধর্মগুরুর পন্থাই নির্ভুল। এমনকি তাদের কাউকে কাউকে সন্তান লাভের জন্য, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি লাভের জন্য, পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য বিশেষ বিশেষ পীর এবং মৃত ওলীর দরগাহে গিয়ে ধরনা দিতে দেখা যায়। আবার অনেকে সগর্বে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে জানান যে, অমুক দরবারে গিয়ে আমি অমুক অমুক জিনিস লাভ করেছি। এভাবে ব্যাপারটি ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিপূজার দ্বারকেও প্রসারিত করে তুলছে।

উপরোক্ত এই আকীদা বিশ্বাস তৎকালীন আরবের মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাসের সাথে হুবহু মিলে যায়। তখনকার মুশরিকরাও এক আল্লাহকে অস্বীকার করত না। তারা আল্লাহকে স্বীকার করার পাশাপাশি অন্যান্য দেব-দেবীদেরও উপাসনা করত। এর প্রমাণ হলো- তাদেরকে যখন দেবদেবীর উপাসনার অসারতার কথা বলা হতো, তখন তারা জবাবে বলতো:

(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفًا)

"আমরা তো তাদের উপাসনা কেবল এ কারণেই করি যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।"[৯৫]

এখানে তৎকালীন মক্কার কাফিরদের কথা বিবৃত হলেও প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার সব কাফির মুশরিকদের একই অবস্থা। এক আল্লাহকে তারা সবাই স্বীকার করে। কিন্তু তাদের মতে আল্লাহর দরবার অনেক উঁচু। তাদের পক্ষে সেখানে (এত উঁচুতে) পৌঁছা সম্ভব নয়। তাই তারা এসব সত্তাদেরকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার জন্য মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। বর্তমান মুসলিম সমাজের বিশেষ ব্যক্তি পূজারীদের অবস্থাও অথৈবচ। তারাও মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য এদেরকে মাধ্যম হিসেবে মনে করে। অথচ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন:

(ادْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَـــةً إِنَّـــهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْـــتَدِيْنَ)

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৯৬]

হাদীস শরীফে আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَـــبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْـــتَجِيْبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْـــأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْـــتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ ؟

"প্রতিটি রাতের এক তৃতীয়াংশ যখন বাকী থাকে, তখন স্বয়ং আমাদের প্রভু দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন: ওহে ! কে আছ, যে আমাকে ডাকবে। আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাবে। আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কে আছ, যে আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাবে। আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।"[৯৭]

অতএব, কোন প্রকার মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই আল্লাহর 'ইবাদাত করতে ও তাঁর কাছে চাইতে আমরা আদিষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে

---

[৯৫] আল-কোরআন: সূরা আয্-যুমার, ৩৯:৩

[৯৬] আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৫

[৯৭] সহীহুল বুখারী (কিতাবুত তাহাজ্জুদ), হাদীস নং- ১১৪৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭৫৮

আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে তাঁর সকল প্রয়োজনের কথা আল্লাহকে বলতেন এবং আমাদেরকেও সকল কিছু আল্লাহরই কাছে চাইতে বলেছেন। সেই সাথে তিনি আমাদেরকে তাঁকে নিয়েও কোন প্রকার অতিরঞ্জন এবং বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

لاَ تَطْرُوْنِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَـــبْدٌ، فَقُوْلُوْا: عَـــبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ .

"তোমরা আমার এমন অতিপ্রশংসা করোনা যেমন খৃস্টানগণ ঈসা ইবন মারইয়ামের অতি প্রশংসায় লিপ্ত হয়েছিল। কেননা, আমি একজন বান্দাহ। তাই আমাকে আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল বলে উল্লেখ করো।"[৯৮]

এ হাদীসে উল্লেখিত 'এতরা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা। যেমনটি নাসারারা ঈসা ইবন মারইয়ামের (আলাইহিমুস্ সালাম) ক্ষেত্রে করেছে। এবং এভাবে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে আমাদেরকে এরূপ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজে যখন কোন পেরেশানীতে পড়তেন, তখন বলতেন:

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْـــتَغِيْثُ .

"হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ার ওসীলায় সাহায্য চাচ্ছি।"[৯৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ ، وَ إِذَا اسْـــتَـــعَنْتَ فَاسْـــتَعِنْ بِاللهِ .

"যখন কোন কিছু চাও একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাও, আর যখন বিপদে সাহায্য কামনা কর, তখনও একমাত্র তাঁর নিকটেই কামনা কর"।[১০০]

তিনি আরো বলেছেন: "সাবধান! দীনের মধ্যে অতিরঞ্জন করোনা। তোমাদের আগে যারা ছিল তারা দীনের মধ্যে অতিরঞ্জনের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে"।[১০১]

---

[৯৮] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৪৪৫

[৯৯] আত্ তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫২৪

[১০০] জামি' আত্-তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫১৬

[১০১] 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন বায, উজূবু লুযুমিস্-সুন্নাহ ওয়াল হাযারি মিনাল বিদ'আহ, পৃ. ২৪

হুসাইন ইবন ‘আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَا تَرْفَعُوْنِيْ فَوْقَ حَقِّيْ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِتَّخَذَنِيْ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِيْ رَسُوْلًا .

“তোমরা আমাকে আমার প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে উপরে স্থান দিও না, কেননা মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করার আগে বান্দাহ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন”।[১০২]

আর এই যদি হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নিজের অবস্থা, তাহলে দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তির অন্ধ আনুগত্য করা, তাকে আল্লাহর মাকবুল বান্দাহ বলে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করা অথবা আল্লাহর কাছে পৌঁছার একমাত্র সঠিক মাধ্যম মনে করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

‘ইবাদাত হলো ইসলামের প্রথম নির্দেশ:

আল-কোরআন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশাবলী ও যাবতীয় নিষেধাবলীর সমন্বিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মহান আল্লাহর সকল আদেশ ও নিষেধকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মানুষের জন্য যত করণীয় এবং যত বর্জনীয় বিষয় আছে, তা সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ গ্রন্থে বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ সবগুলো আদেশ (করণীয় বিধান) এবং নিষেধ (বর্জনীয় বিধান) কোরআনের একই জায়গায় স্থান পায়নি। কোনটি স্থান পেয়েছে কোরআনের শুরুতে, আবার কোনটি শেষে। কোনটি শুধু মু'মিন কিংবা আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে, আবার কোনটি সমগ্র মানবতার উদ্দেশ্যে। তবে কোরআনে উল্লেখিত ইসলামের সর্বপ্রথম যে নির্দেশনা সেটি হলো সমগ্র মানবতাকে লক্ষ্য করে।

লাওহে মাহফুযে আল-কোরআন যেভাবে সংরক্ষিত আছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনায় তা যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে হিসেবে এর প্রথম নির্দেশই হলো ‘ইবাদাত। ‘ইবাদাতের নির্দেশ সম্বলিত এই আয়াতের আগে আল-কোরআনের মধ্যে আর কোন আদেশ সূচক বাক্য নেই। সে হিসেবে এই বাক্যটিই হলো ‘ইবাদাত সংক্রান্ত মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম নির্দেশ। সেখানে তিনি সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন:

---

[১০২] আত্-তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর, হাদীস নং- ২৮৮৯

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُوْنَ . اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

“হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ‘ইবাদাত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায় যে, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা, আর আকাশকে করেছেন ছাদ স্বরূপ। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ স্থির কর না। মূলত: এসব তো তোমরা জান।”[১০৩]

উক্ত আয়াতে সমগ্র মানবতাকে কেবল আল্লাহর ‘ইবাদাত বা দাসত্বের দিকে আহবান জানানো হয়েছে এবং এই দাসত্বে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল-কোরআনের আয়াতগুলো যে পরম্পরায় আমাদের সামনে সাজানো আছে তাতে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত এটিই কোরআনের প্রথম আয়াত। সুতরাং ‘ইবাদাত হলো ইসলামের প্রথম আদেশ এবং শিরক হলো ইসলামের প্রথম নিষেধ। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর ‘ইবাদাত করার ব্যাপারে আমাদেরকে সর্বপ্রথম আদেশ করেছেন এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার ব্যাপারে সর্বপ্রথম নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

‘ইবাদাতের আরেক কোরআনী পরিভাষা হলো ‘আমলে সালেহ’:

কোরআনুল কারীমে ‘ইবাদাতকে আরেকটি পরিভাষায়ও প্রকাশ করা হয়েছে। তা হলো ‘আমলে সালেহ’ বা নেক/সৎ আমল। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا)

---

[১০৩] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২১-২২

"যে তার রবের সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন আমলে সালেহ্ (নেক কাজ) করে, আর তার রবের 'ইবাদাতে তাঁর সাথে কাউকে যেন শরীক না বানায়।"[১০৪]

এ আয়াতে আমলে সালেহের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং মহান আল্লাহর 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া আমলে সালেহের আদেশ দেয়ার বিষয়টিকে পরকালে রবের সাথে সাক্ষাতের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত: আমলে সালেহের আবশ্যকতাকে আরো জোর দিয়ে বলাই উদ্দেশ্য। কেননা পরকালে রবের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি অবধারিত। কেউ তা চাক কিংবা না চাক রবের সাক্ষাতকে সে এড়াতে পারবে না। তাই যারা রবের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে ঈমান রাখে তাদের জন্য আমলে সালেহ্ তথা 'ইবাদাতে মগ্ন হওয়া অত্যাবশ্যক। আয়াতের শুরুতে যাকে আমলে সালেহ্ বা নেক কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাকেই আবার পরক্ষণে 'ইবাদাত বলা হয়েছে। এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'ইবাদাতেরই অপর নাম হলো আমলে সালেহ্। ইমাম ইবন কাছীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ) أي ثوابه وجزاءه الصالح (فَلْـيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا) ما كان موافقا لشرع الله (وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله وصوابا على شريعة رسول الله –صلى الله عليه وسلم–

"যে ব্যক্তি তার রবের সাথে সাক্ষাত করতে চায় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর রবের কাছে সওয়াব ও প্রতিদান চায়), সে যেন নেক আমল করে। (অর্থাৎ সে যেন এমন কাজ করে যা আল্লাহর শারী'য়াত সমর্থিত)। আর তার রবের সাথে কাউকে যেন শরীক না বানায়। (অর্থাৎ নেক কাজের মাধ্যমে সে যেন কেবল ঐ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই। আর এ দুটি হচ্ছে আল্লাহর দরবারে গৃহীত আমলের ভিত্তি। কাজটি অবশ্যই শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারী'য়াত অনুযায়ী হতে হবে)।"[১০৫]

---

[১০৪] আল-কোরআন: সূরা আল-কাহফ, ১৮:১১০

[১০৫] তাফসীরুল কোরআনিল 'আজীম, প্রাগুক্ত, খন্ড- ৩, পৃ- ১০৩

আরেকজন বিদগ্ধ ইসলামী পন্ডিত 'আল্লামা আশ্ শাওকানী (রহ.) (মৃ. ১২৫৫ হি./ ১৮৩৪ খৃ.) এ আয়াত প্রসঙ্গে লিখেন:

(فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا) وهو ما دل الشرع على أنه عمل خير يثاب عليه فاعله (وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) من خلقه سواء كان صالحا أو طالحا حيوانا أو جمادا .

"নেক আমল বলতে এমন কাজকে বুঝায় যার পক্ষে শারী'য়াতের দলীল আছে যে, কাজটি ভাল এবং কাজটি যে করবে সে সওয়াব লাভ করবে। আর তার রবের 'ইবাদাতে কাউকে যেন শরীক না বানায় এর অর্থ হলো - তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে ভাল হোক বা মন্দ, প্রাণী হোক বা জড়, কাউকে সে যেন আল্লাহর 'ইবাদাতে শরীক না বানায়।"[১০৬]

সুতরাং কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী 'ইবাদাত বলতে বুঝায় এমন সব কাজকে, যার বিধান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছেন। আর সে কাজটি কেবল তখনি 'ইবাদাত বলে গণ্য হয়, যখন তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো ও শেখানো পন্থায় করা হয়। তাই শারী'য়াত সমর্থিত কোন কাজে যদি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তা যেমন 'ইবাদাত রূপে গণ্য নয়, তদ্রুপ কোন আমলের পক্ষে যদি শারী'য়াতের দলীল না থাকে, তাহলে তা যতই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হোক না কেন তাও 'ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে না।

'ইবাদাত হলো সকল নবী-রাসূলের প্রথম আহবান:

শুধু শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই নন; বরং পূর্বেকার নবী-রাসূলগণও সর্বপ্রথম নিজ নিজ জাতিকে এক আল্লাহর 'ইবাদাতের প্রতিই আহবান জানিয়েছেন। এবং অন্য সব উপাস্যকে পরিহার করে এক আল্লাহর উপাসনার জন্য আদেশ করেছেন। আল-কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের সকলেরই দাওয়াতের ভাষা ছিল এক ও অভিন্ন। তাঁরা বলেছিলেন:

(يَا قَوْمِي اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)

---

[১০৬] আশ্-শাওকানী, মুহাম্মাদ বিন 'আলী বিন মুহাম্মদ, আল-ফাতহুল কাদীর (বৈরূতঃ আল-মাকতাবা আল-'আসরিয়াহ, সং. ১, ১৯৯৬), খন্ড- ৩, পৃ- ৩৯৫

“ওহে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই।”[১০৭]

তাছাড়া যুগে যুগে সকল মানুষই যেন এক আল্লাহর ‘ইবাদাতে ব্রতী হয়, সেজন্যেই নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটেছিল। তাঁরা সকলেই মহান আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার সাধনা করেছেন এবং তাগুতের আধিপত্যকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্যেই আপন আপন সম্প্রদায়কে তাঁরা অন্য সব উপাস্য ছেড়ে দিয়ে শুধু এক আল্লাহর ‘ইবাদাত করতে বলেছেন। মহান আল্লাহ্ এ কথাই অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমাদেরকে জানাচ্ছেন:

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ)

“আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিহার কর।”[১০৮]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন:

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ)

“নি:সন্দেহে তোমরা সকলেই একই জাতিসত্তার (একই ধর্মমতের) অন্তর্ভুক্ত। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমার ‘ইবাদাত কর।”[১০৯]

অন্যত্র সকল রাসূলকে সম্বোধন করে তিনি আরো বলছেন:

(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ) .

“হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি অবগত। আর আপনাদের এই উম্মাত সব তো একই দীনের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা। অতএব, আমাকে ভয় করুন।”[১১০]

তাই সকল নবী এবং রাসূলগণেরই প্রথম এবং প্রধানতম দায়িত্ব ছিল আপন আপন সম্প্রদায়কে মহান আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান জানানো। তাঁরা নিজেরাও এক আল্লাহর দাসত্বের পথ বরণ করে নিয়েছেন, তিনি ছাড়া অন্য সব

---

[১০৭] আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হুদ, ১১:৫০, ৬১, ৮৪ এবং আল-মু'মিনূন, ২৩:২৩

[১০৮] আল-কোরআন: সূরা আন্-নাহল, ১৬:৩৬

[১০৯] আল-কোরআন: সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৯২

[১১০] আল-কোরআন: সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৫১-৫২

উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যুগে যুগে সকল নবী রাসূলগণেরই দাওয়াতের মূল কথা ছিল এটি। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এভাবে বলতেন:

(يَا قَوْمِيْ اعْبُدُوْا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)

"হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই"।[১১১]

নবীগণ সকলেই নিজ নিজ উম্মাতকে আল্লাহর 'ইবাদাতের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন। এবং এটিই ছিল তাঁদের সকলের প্রথম এবং প্রধান আহবান।

'ইবাদাত হলো নির্ভেজাল ভালবাসা ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের সমন্বিত রূপ:

কাউকে ভালবাসার অনিবার্য দাবী হলো তাঁর আনুগত্য করা, আর এ আনুগত্যের অনিবার্য ফল হলো তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ করা। মহান আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা ও তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যই হলো তাঁর 'ইবাদাত বা দাসত্ব। এই ভালবাসা ও আনুগত্যের বহি:প্রকাশ ঘটে তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। এ কারণেই মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার ভালবাসার সম্পর্ককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ)

"আপনি (হে নবী) বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর। যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[১১২]

এই ভালবাসা ও আনুগত্যের বেলায় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁদের একজনকে ভাল না বাসলে আরেক জনের ভালবাসা পাওয়া যায় না। এবং একজনের আনুগত্য

---

১১১. আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; হূদ, ১১: ৫০, ৬১, ৮৪ এবং আল-মু'মিনূন, ২৩: ২৩

১১২. আল-কোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:৩১

অস্বীকার করলে আরেক জনেরও আনুগত্য করা হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ .

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে যেন আল্লাহরই নাফরমানী করল।"[১১৩]

এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণাও রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا)

"যে লোক রাসূলের হুকুম মান্য করবে, সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করলো আমি আপনাকে (হে মুহাম্মাদ) তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"[১১৪]

মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের এই সমন্বিত রূপই হলো 'ইবাদাত। কেননা আনুগত্যহীন ভালবাসা হলো অন্ত:সার শূন্য। আর ভালবাসাহীন আনুগত্য হলো কপটতার শামিল। কাউকে ভালবেসে থাকলে যেমন তার আনুগত্য অস্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ কারো প্রতি ভালবাসা না থাকলে সঠিকভাবে তার আনুগত্যও করা যায় না। এরূপ আনুগত্য কেউ প্রকাশ করে থাকলেও তা কখনো নির্ভেজাল হতে পারে না। যেমনটি ছিল মদীনার মুনাফিকদের অবস্থা। তারা প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও গোপনে গোপনে তাঁকে মেরে ফেলার এবং তাঁর মিশনকে ব্যর্থ করে দেয়ারই চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। অর্থাৎ তাদের এ আনুগত্য ছিল ভালবাসাবিহীন। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারাও তাঁকে মনে প্রাণে ভালবাসত, কিন্তু তারা তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি এবং তাঁর আনুগত্য করতে রাজী হয়নি। তাই এ ভালবাসা তাদের কোন কাজে আসেনি।

সুতরাং আনুগত্য ও ভালবাসা এ দু'য়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তাও আবার করতে হবে পূর্ণ মাত্রায়। অর্থাৎ আংশিক ভালবাসা কিংবা আংশিক

---

[১১৩] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৭১৩৭ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৩৫

[১১৪] আল-কোরআন: সূরা আন্-নিসা, ৪:৮০

আনুগত্য থাকলেও চলবে না। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আংশিক ভালবাসা থাকলে তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য করতে মন চাইবে না। আর আংশিক আনুগত্য করলে তা শিরকমুক্ত 'ইবাদাত বলেও গণ্য হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহর ভালবাসা ও আনুগত্যকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা ও আনুগত্যের সাথে শর্তযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণমাত্রায় ও সর্বাধিক ভালবাসাকে ঈমানের পূর্ব শর্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবন মালিক (রা.) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং অন্য সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই"।[১১৫]

শুধু তাই নয়, একজন মু'মিনের কাছে তার ঈমানের দাবী হলো- কেবল অন্য সব মানুষের চেয়ে নয় বরং তার নিজের চেয়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক ভালবাসা। একবার 'উমার (রা.) এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে (আমার নিজেকে ছাড়া) দুনিয়ার সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম! হে 'উমার, তুমি এখনো মু'মিন হতে পারনি। বিনীত কণ্ঠে হযরত 'উমার শুধালেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে তাহলে কি করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানালেন: তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমাকে অধিক ভালবাসতে হবে। 'উমার (রা.) বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন থেকে আপনি আমার কাছে আমার নিজের চেয়েও অধিক প্রিয়। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: (اَلآنَ يَا عُمَرُ) 'হে 'উমার! এতক্ষণে তুমি মু'মিন হলে'।[১১৬]

---

[১১৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-১৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭০

[১১৬] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৩৬৯৪, ৬২৬৪ ও ৬৬৩২

'উমারের এ ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভাল না বেসে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানের দাবীদার হলে তার দাবী মিথ্যা।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বাধিক ভালবাসা ও একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য করাই হলো 'ইবাদাত। আর তাঁকে ভালবাসার সর্বোত্তম নমুনা হলো, তাঁর আনীত আদর্শের পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রদর্শিত বিধানকেই অনুকরণীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহও চান যে, একজন মু'মিন এভাবেই তাঁর রাসূলকে ভালবাসুক এবং তাঁরই আনুগত্যের ভিতর দিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করুক। এ কারণেই তিনি নিজের ভালবাসা ও সন্তুষ্টিকে নবীর ভালবাসার উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে 'আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) (মৃ. ৭৫১ হি./ ১৩৫০ খৃ.) অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

أَصْلُ الْعِبَادَةِ مَحَبَّةُ اللهِ ، بَلْ إِفْرَادُهُ بِالْمَحَبَّةِ ، وَ أَنْ يَكُوْنَ الْحُبُّ كُلُّهُ لِلّٰهِ ، فَلاَ يُحِبُّ مَعَهُ سِوَاهُ ، وَإِنَّمَا يُحِبُّ لأَجْلِهِ وَفِيْهِ .

"ইবাদাতের মূল হলো- আল্লাহর ভালবাসা। বরং কেবল তাঁকেই ভালবাসা এবং পরিপূর্ণরূপে ভালবাসা। কাজেই তাঁর ভালবাসায় অন্য কাউকে শামিল করবে না; বরং অন্যদের প্রতি ভালবাসাও হবে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে এবং তাঁকে ভালবাসারই কারণে।"[১১৭]

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসেও এ কথারই প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَ أَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ أَعْطَى لِلّٰهِ وَ مَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ .

"যে ব্যক্তি (কাউকে) ভালবাসল কিংবা ঘৃণা করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; আবার কাউকে সহযোগিতা করল কিংবা সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকল আল্লাহরই জন্য, তাহলে সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।"[১১৮]

---

১১৭. ইবন আল-কায়্যিম, মাদারিজুস সালিকীন, খন্ড- ১, পৃ- ৯৯

১১৮. আত তিরমিযী, হাদীস নং- ২৫২১

অতএব, ‘ইবাদাত হলো নির্ভেজাল ভালবাসা ও একনিষ্ঠ আনুগত্যের সমন্বিত রূপ। ভালবাসাহীন আনুগত্য যেমন ‘ইবাদাত নয়, আনুগত্যবিহীন ভালবাসাও তেমনি ‘ইবাদাত নয়। আর এই নির্ভেজাল ভালবাসা ও একনিষ্ঠ আনুগত্য পাওয়ার সর্বপ্রথম অধিকারী হলেন কেবল মহান আল্লাহ্। অত:পর তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা। কেননা তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসাও তাঁর ভালবাসা থেকেই উৎসারিত হয়।

‘ইবাদাত বিশেষ কোন কর্মের নাম নয়ঃ

ইসলামী শারী‘য়াতে বিশেষ কোন কাজের নাম ‘ইবাদাত নয়। বরং এখানে একই কাজ একভাবে করলে হয় ‘ইবাদাত তথা পুণ্য; আবার অন্যভাবে করলে তা হয় মা'সিয়াত বা পাপ। এক সময় করলে হয় পুণ্য, আবার আরেক সময় তা হয় পাপ। এমনকি সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্ব ইত্যাদি মৌলিক আনুগত্যের কাজগুলোও বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ নিয়মে করলে হয় পুণ্য এবং আমরা তা পালন করতে আদিষ্ট। পক্ষান্তরে নিজের ইচ্ছামত অন্য কোন নিয়মে করলে তা হয় পাপ এবং তাই আমরা তা বর্জন করতে আদিষ্ট। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য ইসলামী শারী‘য়াত যে সময় নির্ধারণ করেছে এবং যে নিয়ম পন্থা বাতলে দিয়েছে, সেভাবে তা পালন করা ‘ইবাদাত এবং পুণ্য। আবার সেই একই সালাত নিষিদ্ধ সময়গুলোতে পড়া বর্জনীয় এবং তাতে নিজের ইচ্ছামত রুকূ' ও সিজদা ইত্যাদি বাড়ানো বা কমানো নিষিদ্ধ ও পাপের কাজ বলে গণ্য। রামাদান মাসে সাওম পালন করা ফরয বা অত্যাবশ্যক, কিন্তু ঈদের দিন সাওম পালন করা হারাম বা নিষিদ্ধ। রামাদানের চাঁদ দেখলে সাওম পালন শুরু করতে হয়, আবার শাওয়ালের চাঁদ দেখলে সাওম পালন বন্ধ করে ঈদ পালন করতে হয়। আর তাই চাঁদ দেখা সাপেক্ষে একই দিনে এক দেশে মুসলিমরা সাওম পালন করে এবং আরেক দেশে মুসলিমরা সাওম পালন করে না। এক দেশের মুসলিমরা ঈদ উদযাপন করে এবং আরেক দেশের মুসলিমরা সাওম পালন অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ রামাদান মাসে সাওম পালন করা যেমন ‘ইবাদাত, ঈদের দিন সাওম পালন না করাও তেমনি ‘ইবাদাত। রামাদানের চাঁদ দেখার পরও সাওম পালন না করা যেমন মা'সিয়াত বা পাপ, শাওয়ালের চাঁদ দেখার পরও সাওম অব্যাহত রাখাও তেমনি পাপ।

এমনিভাবে শারী‘য়াতের নির্ধারিত পন্থায় যখন কোন কাজ করা হয়, তখন তা হয় ‘ইবাদাত। কিন্তু শারী‘য়াতের নির্ধারিত পন্থায় না হলে ঐ একই কাজ করা আর ‘ইবাদাত বলে গণ্য নয়। অতএব ‘ইবাদাত কোন বিশেষ কাজের নাম নয়। বরং

শারী'য়াত কাউকে কোন কাজ করতে আদেশ করলে তা হয় তার জন্য করণীয় 'ইবাদাত এবং তা করলে হয় পুণ্য। আর শারী'য়াত কাউকে কোন কিছু করতে নিষেধ করলে সে কাজটিই হয় তার জন্য বর্জনীয় 'ইবাদাত এবং তা বর্জন না করলে হয় পাপ। একইভাবে শারী'য়াত নির্ধারিত পন্থায় করলে যে কাজটি হয় 'ইবাদাত, নিজের বানানো পন্থায় করলে সে কাজটিই হয় বিদ'আত। অর্থাৎ যে কোন কাজই শারী'য়াতের আদেশ কিংবা নিষেধের কারণে হালাল অথবা হারাম হয়, সুন্নাত অথবা বিদ'আত হয়, কিংবা করণীয় অথবা বর্জনীয় হয়।

সুতরাং একই কাজ অবস্থাভেদে ভাল এবং মন্দ; পুণ্য এবং পাপ; আনুগত্য এবং নাফরমানি বলে গণ্য হয়। তাই 'ইবাদাত বিশেষ কোন কাজের নাম নয়। বরং কাজটিকে যেভাবে করলে তা ভাল, পুণ্য এবং আনুগত্য হয়, সেভাবে করাই হলো 'ইবাদাত। আর যেভাবে করলে মন্দ, পাপ এবং নাফরমানি হয়, সেভাবে করা 'ইবাদাত নয়।

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকাও 'ইবাদাত:

'ইবাদাত শুধু কতকগুলো ভাল কাজ করার নাম নয়। বরং ভাল কাজ করা যেমন 'ইবাদাত, মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকাও তেমনি 'ইবাদাত। শুধু ভাল কাজ করলেই 'ইবাদাত করা শেষ হয়ে যায় না; আবার শুধু মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলেও 'ইবাদাত শেষ হয়ে যায় না। ইসলামী শারী'য়াতে তাই ভাল কাজের আদেশ করার পাশাপাশি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশও দেয়া হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের অনেক বর্ণনাভঙ্গী থেকে একথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কোরআন বলছে:

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لاَ تَجَسَّسُوْا وَ لاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ)

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, বেশি বেশি ধারণা করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন অপর কারও (গীবত) পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো

এটা ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।”[১১৯]

উক্ত আয়াতে অহেতুক ধারণা করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, কতক ধারণা গুনাহের কাজ হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ অহেতুক ধারণা করা একটি মন্দ কাজ তথা গুনাহের কাজ। আর এ গুনাহের কাজটি থেকে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে। তাই এ মন্দ কাজটি থেকে বেঁচে থাকাও মহান আল্লাহর একটি নির্দেশ। আর মহান আল্লাহর সকল নির্দেশ (চাই তা করণীয় হোক অথবা বর্জনীয়) পালন করাই হলো ‘ইবাদাত। অতএব এ গুনাহ (অহেতুক ধারণা করা) থেকে বেঁচে থাকাটা একটি ‘ইবাদাত, যেমনিভাবে আয়াতের অপরাপর নির্দেশগুলো (অন্যের ছিদ্রান্বেষণ না করা, গীবত না করা ইত্যাদি) পালন করা ‘ইবাদাত। এবং এ আয়াতে উল্লেখিত মন্দ কাজগুলো বর্জন করার মাধ্যমে যেমনি আল্লাহর নির্দেশ মানা হবে এবং সাওয়াব পাওয়া যাবে, অপরাপর যে কোন মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলেও তেমনি আল্লাহর নির্দেশ মানা হবে এবং সাওয়াব পাওয়া যাবে।

অধিকন্তু করণীয় (অর্জনীয়) ‘ইবাদাতের চেয়ে বর্জনীয় ‘ইবাদাতগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা করণীয় ‘ইবাদাতগুলো অর্জন না করলে ‘আবিদ (‘ইবাদাতকারী) নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু বর্জনীয় ‘ইবাদাতগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বর্জন না করলে ‘আবিদ একাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এর মাধ্যমে অন্যের অধিকারও লুণ্ঠিত হয় এবং তার সাথে সাথে সমাজটাও কলুষিত হয়। একটা পুণ্য সমাজকে যতটা না এগিয়ে দেয়, একটা পাপ সমাজকে তার চেয়ে বহুগুণ পিছিয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে তাই সৎকাজ নিজে করা এবং সৎকাজের আদেশ করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অসৎ কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা এবং অন্যকে তা থেকে নিষেধ করাও তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ এ কারণেই হাদীস শরীফে যাবতীয় হারাম থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে অধিকতর ‘আবিদ (‘ইবাদাতকারী) হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে-

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ
مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

---

[১১৯] আল-কোরআনঃ সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১২

“তুমি হারাম কাজগুলো থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমিই হবে অধিকতর ‘ইবাদাতকারী। আল্লাহ্ তোমার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তুমিই হবে অধিকতর ধনী। তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ কর, তাহলে তুমি হবে মু’মিন। নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ কর, তাহলে তুমি হবে মুসলিম। আর বেশি পরিমাণে হেসো না, কেননা অধিক হাসি অন্তরাত্মাকে মৃত বানিয়ে দেয়।”[১২০]

এই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী হারামকে বর্জনকারী ব্যক্তিও ‘আবিদ বা ‘ইবাদাতকারী বলে গণ্য। কেননা হালাল কাজ করার চেয়ে হারাম কাজ বর্জন করা আরো বেশী কষ্টসাধ্য। মানুষের প্রবৃত্তি তাকে হারাম কাজ করতে যতটা উৎসাহিত করে, হালাল কাজ করতে ততটা নিরোৎসাহিত করে না। অতএব হালাল কাজ করা যেমনি ‘ইবাদাত, হারাম থেকে বিরত থাকাও তেমনি ‘ইবাদাত। আবার জেনে শুনে হারাম কাজ করে ফেললে যেমনি পাপ হয়, ইচ্ছাকৃত ফরয বা ওয়াজিব ছেড়ে দিলেও তেমনি পাপ হয়।

অন্যায় থেকে বিরত না রাখার ভয়াবহ পরিণতিঃ

যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজে যেমন বিরত থাকা উচিত, সমাজের অন্যান্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখা উচিত। অন্যকেও বিরত রাখতে না পারলে শুধু নিজে অন্যায় না করলেই সমাজকে কলুষমুক্ত রাখা যায় না। এ কারণেই ইসলামে অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজটিকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিজে অন্যায় করা যেমন মারাত্মকভাবে নিষিদ্ধ, অন্যকে তা করতে দেয়াও তেমনি নিষিদ্ধ। কাউকে অন্যায় করতে দেখলে চুপ করে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। নিজের সাধ্য অনুযায়ী সেক্ষেত্রে তা প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে হবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ .

“তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে (বল প্রয়োগ করে) প্রতিহত করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়,

---

[১২০] আল-‘আজালূনী, ইসমাঈল ইবন মুহাম্মাদ, কাশফুল খাফা ওয়া মুযীলুল ইলবাস, (বৈরূতঃ দারুল কুতুব, তা. বি.), খ. ১, পৃ. ৪৩, হাদীস নং- ৮৫ (ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী আবূ হুরায়রার সূত্রে দূর্বল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

তাহলে সে যেন তা তার মুখ দিয়ে (উপদেশের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। আর যদি তাও করতে সক্ষম না হয়, তাহলে যেন অন্তত: মন দিয়ে (অন্তরে ঘৃণা করে কিংবা মনে মনে পরিকল্পনা করে) হলেও তা প্রতিহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর এটি হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম দিক।"[১২১]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَ لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ .

"হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন: ঐ সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ- তোমরা অবশ্য অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অন্যথায় আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবতীর্ণ করা হবে। অত:পর তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে না"।[১২২]

একে অপরকে অন্যায় থেকে বিরত না রাখার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে, আমি নিজে তো আর কোন অন্যায়ে লিপ্ত হচ্ছি না। অন্যের পাপের জন্য আমার এত চিন্তিত হয়ে লাভ কি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যের পাপকে প্রশ্রয় দেয়ার কুফল নিজের উপরও বর্তায়। নিজে হারাম কাজ করা আর অন্যকে হারামের সুযোগ করে দেয়া এক নয়। নিজে একাকী কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতিফল কেবল নিজের উপরই বর্তায়। কিন্তু জেনে শুনে অন্যকে হারাম কাজের সুযোগ করে দিলে এর প্রভাব কেবল তার উপরই বর্তায় না, বরং যিনি এ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন, তিনিও তাতে সমান ভাগীই হন। তাছাড়া হারাম কাজটি যে করছিল সে তখন আসকারা পেয়ে যায়। তার মধ্যে আর লজ্জাবোধ থাকে না এবং সে পরবর্তী সময়ে পূণরায় এটি করতে উৎসাহ বোধ করে, অন্যদেরকেও এ কাজে আহবান করার সাহস পেয়ে যায়। এমনিভাবে ঐ হারাম কাজটি তখন পর্যায়ক্রমে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। দেখাদেখি

---

১২১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৪৯

১২২. আত তিরমিযী, বাবুল ফিতান, হাদীস নং- ২১১৫

আরো অনেকে হয়ত তা করতে শুরু করে দেয়। পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তখন তা আর খারাপ কাজ বলে গণ্য থাকে না, বড়জোর এটিকে একটি সামাজিক মন্দ প্রথা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম তাই যাবতীয় ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করেছে এবং মন্দ কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَنْ سَنَّ فِيْ اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِ هِمْ شَيْئٌ ، وَ مَنْ سَنَّ فِيْ اْلإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِ هِمْ شَيْئٌ .

"যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল কাজের প্রচলন করল, সে তার প্রতিদান পাবে এবং যারা তার দেখাদেখি পরবর্তীতে সেই ভাল কাজটি করল, তাদের প্রতিদানে কোন কমতি না করেই সমান প্রতিদান তাকেও দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের প্রচলন করল, তার উপর সেই পাপের বোঝা বর্তাবে এবং তার দেখাদেখি সেই মন্দ কাজটি আরো যারা করল, তাদের শাস্তিতে কোন কমতি না করেই সমান শাস্তি তার আমলনামায়ও লেখা হবে।"[১২৩]

আল-কোরআনে তাই মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

(وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ)

"আর নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর। গুনাহের কাজ ও বাড়াবাড়িতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর।"[১২৪]

অতএব, ভাল কাজ নিজে করা এবং অন্যকে করতে সহযোগিতা করা যেমনি জরুরী, মন্দ কাজ নিজে না করা এবং অন্যকে করতে না দেয়াও তেমনি জরুরী। আল-কোরআনের ভাষায় মু'মিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যায় থেকে

---

[১২৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১০১৭

[১২৪] আল-কোরআন: সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২

বিরত করার পরও যারা সীমা লংঘন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি দেন। আর যারা তাদেরকে বিরত করেছিল, তারা ঠিকই শাস্তি থেকে মাফ পেয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন-

(فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ . فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نَهَوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ)

“অবশেষে যখন তারা ঐ হিদায়াতকে একেবারেই ভুলে গেল, যা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন আমি ঐসব লোককে রক্ষা করলাম, যারা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করত। আর বাকী সব লোক যারা যালিম ছিল, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম। তারপর যখন তারা পুরা দাপটের সাথে ঐ কাজই করতে লাগল, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি বললাম, তোমরা বানর হয়ে যাও অধম ও অপমানকর অবস্থায়।”[১২৫]

পূর্বেকার উম্মাতদেরকে মহান আল্লাহ্ কখনো কখনো এভাবেই প্রকাশ্য শাস্তিতে নিপতিত করেছিলেন। সেসব ঘটনার কিছু কিছু আল-কোরআনে এভাবে বর্ণনা করার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে সতর্ক ও সাবধান করেছেন। পরস্পরকে অন্যায় থেকে বিরত না রাখার এরূপ ভয়াবহ পরিণতি থেকে মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেফাযত করুন।

‘ইবাদাতের প্রকারভেদ:

‘ইবাদাত প্রতিপালনের মাধ্যম, পন্থা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ‘ইবাদাতকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন- দৈহিক ‘ইবাদাত ও আর্থিক ‘ইবাদাত। জাহেরী (প্রকাশ্য) ‘ইবাদাত ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) ‘ইবাদাত। এবং আবশ্যিক ‘ইবাদাত ও ঐচ্ছিক ‘ইবাদাত। তবে এই প্রকরণ ‘ইবাদাতকে ছিন্ন-ভিন্ন কিংবা বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত করার জন্যে নয়, বরং ইসলামে এর গুরুত্ব ও অবস্থান চিহ্নিত করার জন্যে। কেননা উপরোক্ত সকল প্রকার ‘ইবাদাতই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া যা আর্থিক ‘ইবাদাত তার মধ্যে দেহের অংশগ্রহণও রয়েছে। আবার যা প্রকাশ্য তার একটি অপ্রকাশ্য দিকও রয়েছে। তেমনিভাবে যা ঐচ্ছিক তা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে

---

১২৫. আল-কোরআন: সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ১৬৫-১৬৬

আবশ্যিকেও রূপ নিতে পারে। আবার যা আবশ্যিক তা ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে লাঘবও হতে পারে। তাই গুরুত্বের বিচারে একটি থেকে আরেকটি কম নয়।

দৈহিক 'ইবাদাত ও আর্থিক 'ইবাদাত:

সাধারণত যেসব 'ইবাদাত শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা পালন করা হয়, সেগুলোকে দৈহিক 'ইবাদাত বলে। যেমন- সালাত আদায় করা, সাওম পালন করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, কোরআন নিজে শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া, সত্য কথা বলা, সত্যের উপদেশ দেওয়া, উপার্জনের জন্য দৈহিক পরিশ্রম করা, কারো মাথায় বোঝা তুলে দিতে সাহায্য করা, জিহাদের ময়দানে সশরীরে অংশগ্রহণ করা, মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করা, রোগীর সেবা করা, সালাম দেওয়া এবং সালামের জবাব দেওয়া, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, পিতা-মাতার খেদমত করা, স্বামীর আনুগত্য করা, সন্তান প্রতিপালন করা, গৃহস্থালী কাজ করা ও এ কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর যেগুলো অর্থ দিয়ে সম্পাদন করা হয়, সেগুলোকে আর্থিক 'ইবাদাত বলে। যেমন- যাকাত আদায় করা, হাজ্জ পালন করা, সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে দেওয়া, করযে হাসানা দেওয়া, আল্লাহর পথে জিহাদের কাজে অর্থ ব্যয় করা, মেহমানের আপ্যায়ন করা, স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, বিধবা-ইয়াতীম ও দু:স্থ-অসহায়দের সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার এগুলোর মাঝে কোন কোনটিতে অর্থের পাশাপাশি দেহেরও সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। যেমন- হাজ্জের মধ্যে অর্থের পাশাপাশি যথেষ্ট দৈহিক কসরতও রয়েছে। এ কারণেই হাজ্জ ফরয হওয়ার জন্যে আর্থিক যোগ্যতার পাশাপাশি দৈহিক সুস্থতারও শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে। এবং কোন ব্যক্তি দৈহিকভাবে হাজ্জ পালনে অসমর্থ হলে সে নিজ অর্থে অন্যকে দিয়ে বদলী হাজ্জ আদায় করাতে হয়। তাছাড়া নিজে হাজ্জ করতে গিয়েও হাজ্জের বিশেষ কোন আমল নিজে নিজে সম্পাদন করতে অপারগ হলে অন্যের সহযোগিতা নিতে পারে।

প্রকাশ্য 'ইবাদাত ও অপ্রকাশ্য 'ইবাদাত:

যে কোন 'ইবাদাতের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটো রূপ রয়েছে। প্রকাশ্য বা বাহ্যিক রূপটিকে আমরা জাহেরী বা প্রকাশ্য 'ইবাদাত বলি। আর অপ্রকাশ্য বা অভ্যন্তরীণ রূপটিকে আমরা বাতেনী বা অপ্রকাশ্য 'ইবাদাত বলি। যেমন - সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি সকল 'ইবাদাতেরই একটি বাহ্যিক রূপ বিদ্যমান। যা

আমরা চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখতে পাই। পক্ষান্তরে এ ‘ইবাদাতগুলোর একটি বাতেনী বা আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। যা চর্ম চক্ষুতে দৃষ্টিগোচর হয় না। যা ‘আব্দ এবং মা‘বূদ তথা যিনি ‘ইবাদাত করছেন এবং যার উদ্দেশ্যে করছেন তাদের দু’জনের মধ্যকার ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ, অন্তরে কুফরী চেতনা লালনকারী ব্যক্তিও অনেক সময় বিশেষ পরিবেশে বাধ্য হয়ে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারে। যেমনটি ছিল মদীনার মুনাফিকদের অবস্থা। তারা মসজিদে নববীতে গিয়ে প্রকাশ্যে সালাত আদায়ও করত। কিন্তু সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্বের অনুভূতি তাদের মনে ছিল না। ফলে তারা আল্লাহকে খুশী করার অভিপ্রায় নিয়ে দাঁড়াত না। পক্ষান্তরে একজন মু’মিন ব্যক্তির সালাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উভয় দিকই হবে স্বচ্ছ ও নির্মল। তার অন্তরাত্মা যেমনি আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে, তেমনি হবে তার বাহ্যিক অবয়ব। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সে খুশী করতে চাইবে না। কিংবা সালাতের ভেতর দাড়ি, টুপি ও আঙ্গুল ইত্যাদি নিয়ে খেলবেও না। আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে একথারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে নিজের দাঁড়িতে হাতাহাতি করতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে মন্তব্য করেছিলেন- (لَوْ خَشِعَ قَلْـــبُهُ لَخَشِعَتْ جَوَارِحُهُ) “যদি তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হত, তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অনুগত হয়ে স্থির থাকত”।[১২৬]

রামাদানের সাওমের বেলায় যেমন সাহরী, ইফতার, তারাবীহ, ফিতরাহ ইত্যাদি সবই প্রকাশ্যে সংঘটিত হয়, তাই এগুলো প্রকাশ্য ‘ইবাদাত তথা সাওমের বাহ্যিক দিক। অপরদিকে তাকওয়ার গুণ অর্জনের যে মহান উদ্দেশ্য এতে লুকায়িত রয়েছে, যা চর্ম চক্ষুতে দেখা যায় না, তা সাওমের অভ্যন্তরীণ দিক তথা বাতেনী ‘ইবাদাত। এমনিভাবে যাকাত, হাজ্জ এবং অন্যান্য সকল ‘ইবাদাতেরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটো দিক বিদ্যমান। এবং এ দুটো দিকই ‘ইবাদাতটির শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক দিকটি এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা বাহ্যিক দিকটি অবস্থাভেদে পরিবর্তন যোগ্য, কিন্তু অভ্যন্তরীণটি অপরিবর্তনীয়। যেমন- একজন অসুস্থ এবং মুসাফির ব্যক্তির সালাতের বাহ্যিক রূপ একজন সুস্থ এবং মুকীম ব্যক্তির সালাতের তুলনায়

---

১২৬. মুফতী মুহাম্মাদ শাফী‘, মা‘আরিফুল কোরআন (সূরা আল-মু’মিনূন এর তাফসীর প্রসঙ্গে), (মুহিউদ্দীন খান অনুদিত ও সম্পাদিত), (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৯১২

ভিন্নতর। কিন্তু উভয়ের বেলাতেই সালাতের অভ্যন্তরীণ চেতনায় পার্থক্য সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই।

আবশ্যিক 'ইবাদাত ও ঐচ্ছিক 'ইবাদাত:

ইসলামী শারী'য়াত যেসব কাজ আমাদেরকে করতে আদেশ করেছে এবং যা না করলে জবাবদিহিতা বা শাস্তির বিধান আছে, তা-ই আবশ্যিক 'ইবাদাত। যেমন- ফরয সালাত আদায় করা, ফরয সাওম পালন করা, ফরয হাজ্জ আদায় করা, ফরয যাকাত প্রদান করা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া, পর্দার বিধান মেনে চলা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা ইত্যাদি। এ জাতীয় কাজগুলো করতে আমরা আদিষ্ট এবং না করলে আমাদেরকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। তাই এগুলো আবশ্যিক 'ইবাদাত। আর আবশ্যিক বলেই সাধারণত: এগুলোতে কোন সাওয়াবের পরিমাণ উল্লেখ থাকে না।

পক্ষান্তরে যেসব কাজ করলে ভাল, কিন্তু না করতে পারলে কিংবা পরিমাণে কম করলে কোন জবাবদিহিতা নেই, সেগুলো ঐচ্ছিক 'ইবাদাত। যেমন- নফল সালাত, নফল সাওম, সাদাকাহ্ বা দান-খয়রাত ইত্যাদি। জবাবদিহিতা নেই বলেই এগুলোকে ঐচ্ছিক 'ইবাদাত বলা হয়। এসব কাজের ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহিত করা হয় এবং কোন কোনটির ব্যাপারে বিপুল পরিমাণ নেকীর কথাও ঘোষণা করা হয়। যেমন- এক হাদীসে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলবে, জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর বৃক্ষ লাগানো হবে।"[১২৭]

অপর এক হাদীসে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ
كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ

---

[১২৭] ইমাম আত্ তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি হাসান হাদীস। হাদীস নং- ৩৪৬০

حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : يُسَبِّحُ مَائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ .

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে ছিলাম, তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন: তোমরা কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম নও? তখন উপস্থিত একজন সাথী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: এক হাজার নেকী কিভাবে অর্জন করা যাবে?! অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কেউ যদি একশতবার (সুবহানাল্লাহ) তাসবীহ পড়ে, তাহলে তার (আমলনামায়) এক হাজার নেকী লিখা হয় অথবা তার এক হাজার গুনাহ মুছে দেয়া হয়।”[১২৮]

ঐচ্ছিক হওয়া সত্ত্বেও এ জাতীয় ‘ইবাদাতের এহেন বিপুল সাওয়াবের ঘোষণার মাধ্যমে মূলত: আবশ্যিক ‘ইবাদাতের গুরুত্বকে আরো বাড়ানো হয়েছে। কেননা পাহাড় সমান ঐচ্ছিক ‘ইবাদাত মিলেও কোন একটি আবশ্যিক ‘ইবাদাতের সমান হতে পারে না, কিংবা এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, অথবা এর ক্ষতিপূরণও করতে পারে না। তবে আবশ্যিক ‘ইবাদাতগুলো যথাযথ পালনের পর ঐচ্ছিক ‘ইবাদাতগুলো আল্লাহর কাছে বান্দাহর মর্যাদাকে সমুন্নত করে। এবং তাকে জান্নাতের উচ্চাসনে সমাসীন করে। কিন্তু কোন একটি আবশ্যিক (ফরয) ‘ইবাদাতকে অবহেলা করে অসংখ্য ঐচ্ছিক (নফল) ‘ইবাদাতের ব্যাপারে তৎপর হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা থেকে বাঁচা যাবে না। এজন্যেই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে-

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ .

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয সালাত ছেড়ে দিল, সে কুফরী করল”।[১২৯]

‘ইবাদাত ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে সেতুবন্ধন:

ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষই মহান আল্লাহর ‘ইবাদাতের ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু তাই বলে এটি শুধু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বরং প্রত্যেকের ‘ইবাদাতের সাথে অপরের একটি যোগসূত্র রয়েছে। এ কারণেই ইসলামের মৌলিক ‘ইবাদাতসমূহে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আর তা হলো এই যে, প্রত্যেকটি

---

[১২৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৬৯৮

[১২৯] আত্ -তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩

‘ইবাদাতকেই সামষ্টিকভাবে আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। যেমন- সালাতের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফরয সালাতকে জামা‘আতের সাথে আদায় করার জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। আর ফরয ব্যতীত অন্যান্য সালাতের মধ্যে কোন কোনটিতে (যেমন- তারাবীহ্ এর সালাত) জামা‘আতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর অন্যান্যগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে পড়তে উৎসাহিত করা হলেও এর জন্য সকলের বেলায় একই রকম কারণ এবং একই সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন- দুখূলুল মসজিদ এর সালাত ও তাহিয়্যাতুল ওযূ এর সালাত ইত্যাদি। এছাড়া সপ্তাহে একদিন সালাতুল জুমু‘আহ, বছরে দুই দিন সালাতুল ঈদ এবং মৃত ব্যক্তির জন্য সালাতুল জানাযাহ ইত্যাদিকে সামষ্টিকভাবে আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। এমনকি একাধিক ব্যক্তির কোন বিশেষ সালাত কাযা হয়ে গিয়ে থাকলে তাও তারা সামষ্টিকভাবেই আদায় করবে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا ، فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بُطْحَانَ ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ تَوَضَّأْنَا لَهَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

“জাবির ইবন ‘আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) খান্দাকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরক্ষণে কুরাইশ কাফিরদেরকে গালমন্দ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, অথচ আমি তো (আসরের) সালাতই আদায় করতে পারলাম না। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহর কসম, আমিও (আসর) পড়তে পারিনি। (রাবী বলেন), অত:পর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (মদীনার নিকটস্থ উপত্যকা) বুতহানে অবতরণ করলাম। তিনি সালাতের জন্য ওযূ করলেন, আমরাও ওযূ

করলাম। সূর্যাস্তের পরই (সেদিন) তিনি (আমাদের নিয়ে) আসরের সালাত আদায় করলেন, এরপর মাগরিব আদায় করলেন"।[১৩০]

জাবির ইবন 'আব্দুল্লাহ (রা.) এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَغَلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً ، فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَأَذَّنَ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ . ثُمَّ قَالَ : مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ غَيْرُكُمْ .

"জাবির ইবন 'আব্দিল্লাহ থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন), খন্দকের দিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য যোহর, আসর, মাগরিব ও 'ইশার সালাত (যথাসময়ে) পড়তে পারেননি। অত:পর তিনি বিলালকে (আযান দেয়ার জন্য) আদেশ করলেন। বিলাল আযান এবং ইকামাত দিলেন। তিনি যোহরের সালাত আদায় করলেন। পূণরায় তাকে আদেশ করলেন। তিনি (বিলাল) আযান এবং ইকামাত দিলেন। অত:পর তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন। এরপর আবার তাকে আদেশ করলেন। তিনি (বিলাল) আযান এবং ইকামাত দিলেন। এবার তিনি মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর আবার তাকে আদেশ করলেন। তিনি (বিলাল) আযান এবং ইকামাত দিলেন। এবার তিনি 'ইশার সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন: তোমরা ছাড়া আর কোন সম্প্রদায় এ সময়ে ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর যিকির করছে না।"[১৩১]

সাওমের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলিমদের জন্য ফরয সাওম আদায়ের অভিন্ন একটি সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। যাতে বিশ্বময় এটি সুষ্ঠুভাবে আদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হতে পারে। এবং এক্ষেত্রে সকলেই একে অপরের সহায়ক হতে পারে। এছাড়া বছর ব্যাপী যেসব ঐচ্ছিক সাওম রয়েছে, তাতেও সময়কালের দিক থেকে সকলের মাঝে একটা চমৎকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

---

[১৩০] সহীহুল বুখারী, (তুরস্কঃ ইস্তাম্বুল, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮১ খৃ.) কিতাবুল মাগাযী, খ. ৫, পৃ. ৪৮-৪৯

[১৩১] মুনীর মুহাম্মদ গাদবান, ফিক্হুস সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যাহ (মক্কা আল-মুকাররামাহঃ জামি'আতু উম্মিল কুরা, মু. ১, ১৪১০ হি.), পৃ. ৪৯৪

যেমন- প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম, আইয়্যামে বীয (প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর সাওম, আশুরার সাওম, শাওয়ালের ছয়টি সাওম এবং 'আরাফাহ দিবসের সাওম ইত্যাদি। এমনকি শা'বান মাসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বাধিক সাওম পালনের বিষয়টিও নি:সন্দেহে 'ইবাদাতের সামষ্টিকতারই প্রমাণ বহন করে। কিছুদিন পর রামাদান মাসে যেহেতু সকল প্রাপ্তবয়স্ককেই বাধ্যতামূলকভাবে সিয়াম পালন করতে হবে তাই নতুন করে সেই সিয়ামের অভ্যাস নিজেদের মধ্যে চালু করার নিমিত্তে এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তিনি উম্মাতের জন্য রেখে গেছেন। 'আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রা.) বলেন:

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وَ فِيْ رِوَايَةٍ : كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيْلاً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"শা'বানের মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত বেশী সাওম পালন করতেন না। কেননা তিনি পুরো শা'বান মাসই সাওম পালন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তিনি শা'বানের বেশীর ভাগই সাওম পালন করতেন"। (মুত্তাফাকুন 'আলাইহি: বুখারী ৪/১৮৬, মুসলিম ২/৭১১)।[১৩২]

উম্মুল মু'মিনীন তথা নবী পরিবারের মহিলাদের শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে যদি তাদের বিগত দিনের কোন সাওম অনাদায়ী থেকে যেত তাহলে সাধারণত পরবর্তী রমাদান এসে যাওয়ার আগেই তাঁরা তাঁদের সেসব সাওম কাযা করে নিতেন। এমতাবস্থায় নিজে নফল সাওম রেখে তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা, তাঁদেরকে সাওম পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা ও সহযোগিতা করাও ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি নিয়মিত অভ্যাস ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সে নবীর উম্মাত হিসেবে আমাদেরও উচিত নিজেদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদেরকে তাদের বাদ পড়ে যাওয়া ফরয আদায়ে সহযোগিতা করা। সাওম পালন করা অবস্থায় তারা যেন আমাদের জন্য কষ্ট করে খাবার তৈরী করতে বাধ্য না হন সে ব্যাপারে সজাগ থাকা। মা-বোনদেরও উচিত নিজেদের বাদ পড়ে যাওয়া সাওমগুলো উম্মুল মু'মিনীনদের অনুকরণে আরেকটি ফরয সাওমের

---

[১৩২] আন-নববী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারফ, রিয়াদুস সালেহীন (রিয়াদ: দারুল ফদল, মু. ১, ১৪১১ হি.), পৃ. ৩৮১, হাদীস নং- ১২৪৭

মৌসুম এসে যাওয়ার আগেই অতিসত্ত্বর কাযা করে ফেলার ব্যাপারে তৎপর হওয়া। এবং এ ব্যাপারে আপন স্বামীদের সহযোগিতা কামনা করা ও তাদেরকে সেই সময়ে নফল সাওম পালনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। তাতে একদিকে যেমন পরিবারের সদস্যদের মাঝে আল্লাহর বন্দেগীর স্পৃহা জেগে উঠবে, অন্যদিকে রামাদানের বাইরে স্বামীর উপস্থিতিতে সাওম পালনের ব্যাপারে অনুমতি নেয়ার কাজটিও হয়ে যাবে। একইভাবে রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার যে বিধান তাও 'ইবাদাতে সামষ্টিকতার আরেকটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রামাদানেই নিজে ই'তিকাফ করতেন। এবং উম্মাতদেরকেও তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

যাকাতের বেলায় এই সামষ্টিকতার চিত্র আরো স্পষ্ট। কেননা এটি ফরযই করা হয়েছে ধনী ও গরীবের ব্যবধানকে কমিয়ে আনার জন্য। সুখে ও দু:খে একে অপরের অংশীদার হওয়ার জন্য। তাছাড়া এক্ষেত্রে ধনী যেন গরীবের প্রতি কৃপা করেছে বলে মনে করতে না পারে এবং গরীবও যেন ধনীর কাছে নিজেকে দায়গ্রস্ত মনে না করে, সেজন্য যাকাতের অর্থ আদায় ও বন্টনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামী সরকারকে। যে সরকার যাকাত দাতা ও যাকাত গ্রহীতা উভয় পক্ষের উপরই দায়িত্ববান। ইসলামী সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এভাবে সামষ্টিক উপায়ে যাকাত আদায় করা হলে যাকাত দাতা জানবে না যে তার যাকাতের মাল কোন্ গরীবের কাছে গেল? ফলে তার উপর কোনরূপ অহংকার করার বা তাকে খোটা দেওয়ার কোন সুযোগ সে পাবে না। অন্যদিকে যাকাত গ্রহীতাও জানবে না যে, কোন্ ধনী ব্যক্তির যাকাতের মাল তার কাছে এল। তাই সে তার প্রতি অহেতুক নমনীয় হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

এমনিভাবে যাকাতের বাইরেও ইসলামে পরস্পরকে সহযোগিতা করার জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। এবং দান করে খোঁটা না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে পরিবার পরিজনের জন্য যা ব্যয় করা হয়, তাকে উত্তম সাদাকাহ এবং অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবেশীদের ব্যাপারেও খোঁজ-খবর রাখতে বলা হয়েছে। তাদেরকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট পুরে খাওয়াকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করাকে ঈমানের সাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং উত্তম প্রতিবেশীকে আল্লাহর নিকট উত্তম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের আরেকটি মৌলিক 'ইবাদাত হলো হাজ্জ। এটি বিশ্ব মুসলিম সম্মিলন। সারা দুনিয়ার বাছাইকৃত মুসলিম বান্দারা একই সময়ে একই নিয়মে একই স্থানে

এসে এটি আদায় করেন। নিজের সুবিধামত সময়ে, নিজের বানানো নিয়মে কিংবা নিজের পছন্দনীয় স্থানে এটি আদায় করা যায় না। আবার কারো নিজের ফরয হাজ্জ আদায় করা থাকলে তিনি তার অসুস্থ কিংবা মৃত ভাইয়ের পক্ষ হয়েও হাজ্জ আদায় করতে পারেন। এমনিভাবে ইসলামের সকল মৌলিক 'ইবাদাতেই ব্যক্তির সাথে সমষ্টিকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি এর বাইরেও ইসলামের অন্যান্য 'ইবাদাতগুলো শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় বরং সামষ্টিক। যেমন- নিজের বাচ্চাকে আদর-স্নেহ করা যেমন 'ইবাদাত, অন্যের বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করাও তেমনি 'ইবাদাত। নিজের পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যেমনি জরুরী, অন্যের পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করাও তেমনি জরুরী। এমনকি পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করাও অতিশয় জরুরী। ইসলাম এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সমাজকে জড়িয়ে রেখেছে। এখানে নিজে সৎ কাজ করা এবং অন্যকে তা করতে বলা, নিজে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকেও বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুসলিম উম্মাহর একটি জাতিগত দায়িত্ব। এ দায়িত্বের ব্যাপারে কোরআনুল হাকীমের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ)

"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, যাদেরকে মানবতার কল্যাণে বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"[১৩৩]

অতএব, একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, 'ইবাদাত হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে এক সেতুবন্ধন। 'ইবাদাতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতিকে এক নিবিড় আত্মিক সম্পর্কে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। একে অপরের ভাই ভাই সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়া এবং সকলে মিলে এক দেহ তুল্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই 'ইবাদাতই হলো প্রকৃষ্ট মাধ্যম।

'ইবাদাত হলো মানব জীবনের এক সাবলীল প্রক্রিয়াঃ

'ইবাদাত কোন অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক কাজের নাম নয়। এটি মানব জীবনের এক সাবলীল প্রক্রিয়া। কোন প্রকার কাঠিন্য ছাড়াই মানুষ অতি স্বাভাবিক

---

[১৩৩] আল-কোরআনঃ সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১১০

প্রক্রিয়ায় তা সম্পাদন করতে পারে। ইসলাম যেমন 'দীনুল ফিতরাহ' তথা স্বভাবগত দীন, 'ইবাদাতও তেমনি স্বভাবগত আচরণ। মানুষের সামর্থ কিংবা সাধ্যের বাইরের কোন কাজকে 'ইবাদাত বলা হয় না। বরং অতি সহজেই যার যার অবস্থানে থেকে পালন করার মত কতক আচরণের নামই 'ইবাদাত। 'আয়িশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ اللَّـــهَ رَفِـــيْقٌ يُـــحِبُّ الرِّفْـــقَ فِيْ الأَمْـــرِ كُـــلِّهِ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ বন্ধুবৎসল ও দয়াপরবশ, তিনি সকল কাজেই সহজতা পছন্দ করেন।"[১৩৪]

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

خُـــذُوْا مِـــنَ الْعَـــمَلِ مَـــا تُـــطِـــيْقُـــوْنَ .

"তুমি ঐ কাজই করতে উদ্যোগী হও, যা করতে তুমি সক্ষম।"[১৩৫]

অর্থাৎ যা মানুষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য কিংবা অসম্ভব তা তার জন্য 'ইবাদাত নয়। সহজ ও সাবলীলভাবে যা সম্পাদন করা যায়, তাই 'ইবাদাত। যে ব্যক্তি দাঁড়ি নামায পড়তে সক্ষম তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা যেমন 'ইবাদাত, ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় তার জন্য না দাঁড়িয়ে বসা অবস্থায় নামায পড়াও তে 'ইবাদাত। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রথম ব্যক্তির জন্য বসে নামায পড়া যে অনুচিত, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও তেমনি অযাচিত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি যে ব্যক্তি বসতেও সক্ষম নয় তার বেলায় বসারও কোন প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْـــتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْـــتَطِعْ فَـــعَلَى جَنْبِكَ .

"তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়, যদি তা (দাঁড়াতে) না পার তাহলে বসে সালাত পড়। যদি তাও (বসতে) না পার তাহলে (শুয়ে) তোমার পার্শ্ব ফিরেই সালাত আদায় কর"।[১৩৬]

---

[১৩৪] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৬৯২৭

[১৩৫] প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২

[১৩৬] 'আলী ইবন 'উমার আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনী, সুনান আদ্-দারা কুতনী (বৈরূত: দার আল-মা'রিফাহ, ১৩৮৬ হি.), খ. ১, পৃ. ৩৮০

ইসলাম মানুষের প্রতি কোন প্রকার কাঠিন্য কিংবা জবরদস্তি প্রদর্শন করে না। নিজের সাধ্য অনুযায়ী যে যেরূপ দায়িত্ব পালনে সক্ষম ইসলাম তাকে সেভাবে ততটুকু দায়িত্বই পালন করতে বলে। সাধ্যের বাইরের কোন কিছুর জন্য তাকে কখনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো-

(لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

"আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর তার সামর্থের চেয়ে বেশি দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না।"[১৩৭]

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন:

(يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা তোমাদের জন্য কঠিন তা তিনি চান না।"[১৩৮]

এমনিভাবে মানুষের অসাধ্য বা কঠিন কোন কিছু ইসলাম মানুষের উপর চাপায় না। তাই একই 'ইবাদাত একজনের বেলায় প্রযোজ্য হলেও আরেকজনের বেলায় তা প্রযোজ্য হয় না। একজনের জন্য একভাবে প্রযোজ্য হলে আরেকজনের জন্য তা আরেকভাবে প্রযোজ্য হয়। একজনের জন্য এক পরিমাণ প্রযোজ্য হলে আরেকজনের জন্য সে পরিমাণ প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

এছাড়া ইসলামে তাওবা করার বিধান, সালাত ও সাওম কাযা আদায়ের ব্যবস্থা, সিজদায়ে সাহুর ব্যবস্থা, তায়াম্মুমের বিধান, সফরকালীন সালাতে কসরের বিধান, মোজার উপর মাসেহ করার বিধান এবং বদলী হাজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে সাবলীলতার বাস্তব নমূনা। মানুষের সাধ্য ও সামর্থ বিবেচনা করেই এসব বিধান চালু করা হয়েছে। সুতরাং স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানব জীবনের এক সাবলীল প্রক্রিয়ার নামই হলো 'ইবাদাত।

ইসলামে 'ইবাদাতের পরিধি:

ইসলামে 'ইবাদাতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। ইসলামের দৃষ্টিতে 'ইবাদাত শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, বরং এটি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত। এমনকি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের

---

[১৩৭] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮৬

[১৩৮] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৫

বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড গুলোও পৃথক পৃথক ভাবে ‘ইবাদাতের মধ্যে গণ্য হতে পারে, যদি তা যথাযথভাবে শারী‘য়াত নির্ধারিত পন্থায় পালিত হয়। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ইসলামে ‘ইবাদাতের সেই ব্যাপকতারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। ইরশাদ হয়েছে:

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَ قُـــعُوْدًا وَ عَلَى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّـــنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে (সর্বাবস্থায়ই) আল্লাহকে স্মরণ করে, আর আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের রব, তুমি নিশ্চয়ই এগুলোকে অযথা সৃষ্টি করনি। পবিত্র ও মহান তোমার সত্ত্বা। আমাদেরকে তুমি আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর”।[১৩৯]

‘আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ كُلِّ أَحْـــيَانِهِ .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিটি মুহুর্তেই মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করতেন”।[১৪০] অতএব, জীবনের সর্বত্র ও সর্বাবস্থায়ই মহান আল্লাহকে স্মরণ রাখার মাধ্যমে তাঁর ‘ইবাদাতে ব্রতী হওয়াই হলো ইসলামে দীক্ষা। বিশেষ কোন স্থান কিংবা বিশেষ কোন অবস্থার সাথে ‘ইবাদাত সীমাবদ্ধ নয়। তাইতো মুহাম্মাদ আল-গাযালী (রহ.) (মৃ. ৫০৫ হি./ ১১১১ খৃ.) যথার্থই বলেছেন:

إِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ أَفْعَالاً تُعَدُّ عَلَى الْأَصَابِعِ دُوْنَ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ . كَلاَّ ، إِنَّـــهُ صَلَاحِيَةُ الْإِنْسَانِ لِلْمَسِيْرِ فِيْ الْحَيَاةِ وَهُوَ يُؤَدِّيْ رِسَالَةً مُحَدَّدَةً .... إِلَى آخِرِ مَا قَالَ .

“ইসলাম শুধু এমন কয়টি কাজের নাম নয়, যা হাত দিয়ে গণনা করা যায়, কমও না কিংবা বেশিও না। কক্ষনো নয়, এটি বরং জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে চলার পথে মানুষের যথার্থ উপযুক্ততার নাম।”[১৪১]

---

[১৩৯] আল-কোরআন: সূরা আলি ‘ইমরান, ৩:১৯১

[১৪০] আল-জামি‘ আত-তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

[১৪১] আল-গাযালী, মুহাম্মদ, হাযা দীনুনা, পৃ. ৮৪

নিম্নে আমরা কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ‘ইবাদাতের ব্যাপক পরিধি নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব।

জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডও ‘ইবাদাত:

অনেকে মনে করেন যে, মসজিদে অবস্থান করে আমরা যেসব কাজ করি, কিংবা ঘরে বসে যেসব তাসবীহ, তাহলীল এবং তিলাওয়াত ইত্যাদি করি, কেবল তা-ই ‘ইবাদাত। নিজেদের জীবিকার প্রয়োজনে আমরা ঘরে-বাইরে , অফিসে-আদালতে, হাটে-বাজারে , মাঠে-ময়দানে এবং দেশে-বিদেশে যে সব কর্মকান্ডে জড়িত হই, তা নিশ্চয় ‘ইবাদাত নয়। বরং এগুলো আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন, যা দিয়ে আল্লাহর কোন কাজ নেই। আসলে এরূপ ধারণা পোষণকারী লোকেরা মারাত্মক ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। কেননা প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ আমাদের কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। আমরা যা বাজারে বন্দরে করি, তার যেমন তিনি মুখাপেক্ষী নন, তেমনি মুখাপেক্ষী নন যা আমরা তাঁর ঘরে বসে করি তারও। বরং ঘরে বাইরে সর্বত্র যখনই যা আমরা আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে করে থাকি, তারই মাঝে তিনি আমাদের আনুগত্য দেখতে চান। আর এ অর্থেই তিনি ঘোষণা করেছেন:

(وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْـــبُدُوْنِ)

আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে শুধু আমার দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছি।”[১৪২]

এ আয়াতে মানব ও জ্বীনকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে তা কেবল আল্লাহর ‘ইবাদাতেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ চান যে, এরা কেবল তাঁর ‘ইবাদাতই করুক, অন্য কিছু নয়। আয়াতটিকে তাই প্রথমে না বোধক দিয়ে শুরু করে তারপর ‘ইবাদাতের কথা দিয়ে সেটিকে হ্যাঁ বোধক করা হয়েছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ চান না যে, এরা তাঁর ‘ইবাদাত ছাড়া অন্য কিছু করুক। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, মানুষেরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যেসব কর্মকান্ডে অনিবার্যরূপে অংশগ্রহণ করে থাকে সেগুলো কি তাহলে মহান আল্লাহ অনুমোদন করেন না অথবা সেগুলোও কি তাঁর ‘ইবাদাত নয়? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে কেনইবা মানুষ এসব কিছু করতে বাধ্য হয়? সেকি তাহলে সৃষ্টিগতভাবেই তার জীবনের একটা বিরাট সময় আল্লাহর

---

[১৪২] আল-কোরআন: সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১:৫৬

‘ইবাদাতের বাইরে থাকতে বাধ্য? নিশ্চয়ই তা নয়। মহান আল্লাহ নি:সন্দেহে এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ কথা থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

পবিত্র কোরআনে আমরা দেখতে পাই যে, জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা করা মহান আল্লাহই আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সূরা আল-জুমু‘আয় আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণাটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ)

“যখন নামায শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে থাক।”[১৪৩]

এমনিভাবে মৌলিক ‘ইবাদাতের সাথে সাথে রিযক অন্বেষণের কাজটিকেও আল-কোরআনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্যত্র তাই রিযকের অন্বেষণে ভ্রমণকারী এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

(عَلِمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ)

“তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর।”[১৪৪]

এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনের ন্যায় পবিত্র হাদীসে নববীতেও অনেক ভাষ্য বিদ্যমান। যেমন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ .

“কোন মুসলিম যদি কোন বীজ বপন করে অথবা চারা রোপন করে, অত:পর তা থেকে যদি কোন পাখি, মানুষ অথবা কোন জন্তু ভক্ষণ করে, তাহলে তা তার জন্য সাদাকাহ স্বরূপ হবে।”[১৪৫]

---

[১৪৩] আল-কোরআন: সূরা আল-জুমু‘আহ, ৬২:১০

[১৪৪] আল-কোরআন: সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ৭৩:২০

[১৪৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ২৩২০, ৬০১২ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৫৫৩

অন্য এক হাদীসে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَ مَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَ لاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ .

“কোন মুসলিম যখনই কোন বীজ বপন করে এবং তা থেকে যা খাওয়া হয়, তা তার জন্য সাদাকাহ হবে। সেখান থেকে যা চুরি যায় তাও তার জন্য সাদাকাহ হবে। তা থেকে জন্তু জানোয়ারেরা যা ভক্ষণ করে তাও তার জন্য সাদাকাহ হবে। আর যা পাখি খেয়ে নেয় তাও তার জন্য সাদাকাহ হবে। এমনকি কেউ যদি তা ধ্বংস করে অথবা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাও তার জন্য সাদাকাহ রূপেই গণ্য হবে”।[১৪৬]

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ اْلأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ .

সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীগণ নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সংগে কবেন।”[১৪৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন:

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ .

“সম্পদশালী ও সুস্থ মানুষের জন্য কারো সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া হালাল নয়।”[১৪৮]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশা গ্রহণ করা যাবে। এ ব্যাপারে ইসলামী শারী‘য়াত আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে এবং সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যের দ্বারস্থ হতে বারণ করেছে। সুতরাং নিজেদের জীবিকার

---

১৪৬. মুখতাসারু সহীহি মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৯৭৮

১৪৭. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি হাসান হাদীস। হাদীস নং- ১২০৯

১৪৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৬৫২

প্রয়োজনেও আমরা যত রকম কর্মকান্ডে জড়িত হই, তা সবই আল্লাহর ‘ইবাদাত হয়ে থাকে, যদি তা আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় করা হয়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেমত যে কোন পেশাই ‘ইবাদাত হয়ে যাবে তা নয়। বরং এর জন্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

পেশাগত এসব কাজ ‘ইবাদাত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত:

জীবন নির্বাহের জন্য আমরা বিভিন্ন রকম পেশা এবং কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করে থাকি। এসব কর্মকান্ডের সবই যার যার মত যে কোন উপায়ে করলেই ‘ইবাদাত হয়ে যাবে না, বরং এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তগুলো অবশ্যই বিদ্যমান থাকা চাই।

এক: ইসলামী শারী‘য়াতের দৃষ্টিতে কাজটি বৈধ হওয়া চাই। অতএব যেসব কাজকে ইসলামী শারী‘য়াত বৈধ হিসেবে অনুমোদন করে না, সেসব কাজ কখনোই ‘ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে না। যেমন- মদ, জুয়া, সুদী কারবার, ব্যবসার ক্ষেত্রে ওজনে কম দিয়ে অথবা ইয়াতিমের মালের সাথে নিজের মালকে মিলিয়ে হেরফের করে, কিংবা পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে তা কখনো ‘ইবাদাত রূপে গণ্য হতে পারেনা। কেননা এ কাজগুলো মূলত:ই শারী‘য়াতে সিদ্ধ নয়। আল-কোরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ
مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ
أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ)

“ওহে যারা ঈমান এনেছ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ- এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?”[১৪৯]

---

[১৪৯] আল-কোরআন: সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:৯০-৯১

উপরোক্ত আয়াতে মদ, জুয়া ইত্যাদিকে মহান আল্লাহ শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করে এগুলোকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বারণ করেছেন। অন্যদিকে সুদের ব্যাপারে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো:

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ)

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমরা অত্যাচারিতও হবে না।"[১৫০]

আবার ওজনে কম দেয়া প্রসংগে মহান আল্লাহর ঘোষণা হলো:

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ . اَلَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ . وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ)

"দুর্ভোগ তাদের জন্যে, যারা মাপে কম করে। যারা লোকদের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।"[১৫১]

অপরদিকে ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে নেয়া থেকেও মহান আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

(وَآتُوْا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوْا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا)

"ইয়াতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালামালের সাথে ভালো মালামালের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-

---

[১৫০] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৭৮-২৭৯

[১৫১] আল-কোরআন: সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন, ৮৩:১-৩

সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করে নিও না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ।"[১৫২]

হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَأَنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

"নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। ঈমানদার লোকদের তিনি সে আদেশই দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর নবী-রাসূলগণকে।"[১৫৩] তিনি (আল্লাহ) বলেছেন: "হে রাসূলগণ! পবিত্র দ্রব্যসামগ্রী খাও ও নেক কাজ কর। তোমরা যা কিছুই কর, আমি সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।"[১৫৪]

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড: ইউসুফ আল-কারদাবী লিখেছেন-[১৫৫] দুনিয়ার মানুষের প্রতি আল্লাহর বড় রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি হালাল যেমন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, তেমনি হারামকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। আল-কোরআনে বলা হয়েছে: (وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) "তোমাদের প্রতি যা যা হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।"[১৫৬] কাজেই যা সুস্পষ্টরূপে হালাল তা করায় কোন বাধা থাকতে পারেনা। আর যা সুস্পষ্টরূপে হারাম, কোনরূপ উপায়হীন অবস্থা ভিন্ন সাধারণভাবে তা করার কোন অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এতদ্ব্যতীত এ সুস্পষ্ট হালাল ও সুপ্রকট হারামের মাঝখানে সন্দেহপূর্ণ জিনিসগুলোরও একটা পর্যায় রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এগুলোর সন্দেহপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো- অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রমাণ অস্পষ্ট থাকে। .... এমতাবস্থায় মানুষ যাতে সন্দেহপূর্ণ কাজটি করে ফেলে হারামের মধ্যে লিপ্ত না হয়ে যায়, সেজন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

[১৫২] আল-কোরআন: সূরা আন্-নিসা, ৪:২

[১৫৩] তিরমিযী, হাদীস নং- ২৯৮৯

[১৫৪] আল-কোরআন: সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:৫১

[১৫৫] আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (মাওলানা আব্দুর রহীম অনূদিত), (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মু. ৫, ১৯৯৫), পৃ-৫৫

[১৫৬] আল-কোরআন: সূরা আল-আন'আম, ৬:১১৯

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ বিষয়ে একটি সুন্দর মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ
يَدْرِيْ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمِ الْحَرَامِ ؟ فَمَنْ
تَرَكَهَا اِسْتِبْرَاءً لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ ، وَ مَنْ وَاقَعَ
شَيْئًا مِنْهَا يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ . كَمَا أَنَّ مَنْ يَرْعَى
حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى
أَلاَ وَ إِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ .

"হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। এ দুটির মাঝখানে কতিপয় জিনিস সন্দেহপূর্ণ। সেসব সম্পর্কে অনেক লোকেরই জানা নেই যে, আসলে তা হালাল না হারাম। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন ও স্বীয় মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব থেকে দূরে থাকে, সে নিশ্চয় নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তন্মধ্য থেকে (সন্দেহপূর্ণ) কোন কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়বে, তার পক্ষে হারামের মধ্যে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্তুগুলোকে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে চরায়, তার পক্ষে সে নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তোমরা শোনে রাখ, প্রত্যেক রাজা-বাদশাহরই একটি 'সুরক্ষিত চারণভূমি' থাকে। জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর হারাম করা জিনিসগুলোই তাঁর সংরক্ষিত চারণভূমি।"[১৫৭]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম শুধু অবৈধ ও হারামকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। সাথে সাথে যাবতীয় বৈধ ও হালাল উপার্জনের ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করেছে। হালালের উপর চলা কষ্টসাধ্য হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে সেটিই শ্রেয়। অপরের কাছে হাত পেতে বড়লোক হওয়ার চেয়েও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কোন রকম ক্ষুৎপিপাসা মেটানো অনেক উত্তম। যেমন বৈধ ও হালাল রুজির ব্যাপারে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেছেন:

---

[১৫৭] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ২০৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ১৫৯৯ ও তিরমিযী, হাদীস নং- ১২০৫

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً تَعَفُّفًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَ سَعْيًا عَلَى عَيَالِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللهَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

"যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মমর্যাদা রক্ষা, স্বীয় পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ ও নিজের প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার উদ্দেশ্যে, দুনিয়ার হালাল জিনিসসমূহ অর্জন করতে চাবে, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এরূপ অবস্থায় যে, তার মুখমন্ডল পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত অত্যুজ্জ্বল ও আলোকমন্ডিত হবে।"[১৫৮]

দুইঃ কাজটি বিশুদ্ধ নিয়াতে হওয়া চাই। আর জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়াতের বিশুদ্ধতার অর্থ হলো, হালাল রুজির দ্বারা নিজের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন মেটানো, পরিবার পরিজনের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সর্বোপরি মুসলিম উম্মাহর উপকার সাধনের মাধ্যমে আল্লাহর যমীনকে আবাদ করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিয়াতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, যা বুখারী শরীফের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। আর তা হলো-

إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

"নিশ্চয় আমলসমূহের শুদ্ধাশুদ্ধি বা প্রতিফল নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকেই তা পাবে যা সে নিয়াত করেছে। অতএব কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরাত করে থাকে তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিই পাবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে দুনিয়ার কোন সুবিধা প্রাপ্তি কিংবা কোন নারীকে বিয়ে করা, তাহলে সে তা-ই প্রাপ্ত হবে যা সে নিয়াত করেছে।"[১৫৯]

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে একজন ছিলেন যিনি 'উম্মে ক্বাইস' নাম্নী জনৈক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। ইতোমধ্যে ঐ মহিলা সাহাবী হিজরাত করেন এবং ঐ সাহাবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে তিনি তাঁর উপর হিজরাতের শর্ত

---

[১৫৮] আল-বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৯৮

[১৫৯] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ১

জুড়ে দেন। তখন ঐ সাহাবী তাঁকে বিবাহের উদ্দেশ্যেই হিজরাত করতে মনস্থ করেন। এটি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়াতের হাদীসে বিশেষভাবে এ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন। আর এ কারণেই ঐ সাহাবীকে 'মুহাজিরে উম্মে ক্বাইস' বা উম্মে ক্বাইসের উদ্দেশ্যে হিজরাতকারী বলা হত।[১৬০] নিয়াতের এহেন গুরুত্বের কারণে কোন কোন মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে ইসলামের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বলে গণ্য করতেন।[১৬১]

উল্লেখ্য যে, মু'মিনের সকল হালাল কাজই ভাল নিয়াতের সাথে করলে 'ইবাদাত হয়ে যায়। কিন্তু যা মূলত: হারাম, তা সর্বাবস্থায় হারামই থেকে যায়। তা যত ভাল এবং পবিত্র নিয়াতেই হোক না কেন। আর যত উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই তার পেছনে থাকুক না কেন।

তিনঃ একাগ্রতা ও নিপুণতার সাথে কাজটি সম্পন্ন করা চাই। কেননা ইসলামে সকল 'ইবাদাতের বেলায়ই এটি একটি অনিবার্য শর্ত। জিব্রাঈলের (আ.) হাদীসে যাকে ইহসান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এটি ব্যক্তি বিশেষে তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। যেমন জীব্রাঈলের (আ.) প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন:

ٱلإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

"ইহসান বা একাগ্রতা হলো এই যে, তুমি আল্লাহর 'ইবাদাত করার সময় নিজের মধ্যে এরূপ অনুভূতি জাগ্রত করবে যে, মহান প্রভু তোমার সামনে রয়েছেন এবং তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে নাও পার তবে অন্তত এটা বিশ্বাস করবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।"[১৬২]

আর কোন বান্দাহ যখন তার মনিবকে সামনে রেখে এই অনুভূতি নিয়ে কাজ করে তখন তার কাজ নি:সন্দেহে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত হাদীসে 'ইবাদাতের বেলায় ইহসানকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কাজের ক্ষেত্রে এরূপ নিপুণতাই মহান রাব্বুল 'আলামীন পছন্দ করেন। যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১৬০] আল-'আসকালানী, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, (কায়রোঃ দারুর রাইয়্যান, মু. ১, ১৯৮৬), পৃ- ১৬

[১৬১] প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭

[১৬২] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং- ৫০

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্য এক হাদীস থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেছেন:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ .

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর পছন্দ হচ্ছে যে, তোমরা কেউ যখন কোন কাজ কর তখন তা নিপুণতার সাথে করবে।”[১৬৩]

অন্য কথায়, মহান আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ সুন্দর ও উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহসান। যেমন কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

(وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ إِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ)

“যে ব্যক্তি ইহসানকারী হয়ে আল্লাহর নিকট একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, সে তো মজবুত হাতল ধারণ করল। আর সমস্ত কাজের ফলাফল তো আল্লাহরই ইখতিয়ারে।”[১৬৪]

একইভাবে আল-কোরআনের অন্য অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, দুস্থ, ইয়াতীম এবং অতিথিদের প্রতি সদাচরণকেও ইহসান বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ)

“এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।”[১৬৫]

অন্যত্র আল-কোরআন ইহসানের উচ্চ মর্যাদা আরোপ করার পাশাপাশি ইখলাসকেও এর সাথে স্থান দিয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে:

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ)

---

[১৬৩] আত্-তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৫

[১৬৪] আল-কোরআন: সূরা লুকমান, ৩১:২২

[১৬৫] আল-কোরআন: সূরা আন্-নিসা, ৪:৩৬

"তার চেয়ে উত্তম দীনদার কে, যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকে একনিষ্ঠ হয়ে।"[১৬৬]

অর্থাৎ উত্তম দীনদার সেই যে তার আমল কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল। মহান আল্লাহ্ একারণেই সকল কাজে ইহ্সান তথা নিপূণতা ও একাগ্রতাকে অবধারিত করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .

"মহান আল্লাহ্ সবকিছুতেই ইহ্সানকে অবধারিত করে দিয়েছেন"।[১৬৭]

চার: কাজটি করতে গিয়ে শারী'য়াতের সীমারেখা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ নিজের জীবিকা অর্জন করতে গিয়ে অন্যের অধিকার নষ্ট করবে না, কোন ব্যক্তি কিংবা জাতির আমানতের খেয়ানত করবে না। যেমন একজন অফিসারকে সরকারের পক্ষ থেকে যে সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়, তিনি যদি নিজের প্রয়োজনে তা যথেচ্ছা বাড়িয়ে নেন, তাহলে একদিকে তিনি যেমন শারী'য়াতের সীমা লঙ্ঘন করলেন, অন্যদিকে তিনি জাতীয় আমানতের খেয়ানত করলেন। তিনি তার নিয়োগকর্তার সাথে করলেন ধোকাবাজি আর অধীনস্থদের উপর করলেন যুল্‌ম বা অত্যাচার। সরকারী গাড়ি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাজে ব্যবহারের ফলে একদিকে তিনি সরকারী অর্থের অপচয় করলেন, অপরদিকে অধীনস্থ ড্রাইভারকে অতিরিক্ত খাটিয়ে তার উপর অত্যাচার করলেন। অফিসের পিয়নকে বাসার কাজে লাগিয়ে একদিকে পিয়নের নিয়মিত কাজে ব্যাঘাত করলেন, অন্যদিকে কাজে ফাঁকি দেয়ার ব্যাপারে তাকে আশ্‌কারা দিলেন। এভাবে তিনি তাঁর নিজের জীবনের একটা বিরাট অংশকে যেমন 'ইবাদাতের গন্ডির বাইরে ঠেলে দিলেন, তেমনি বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনকে অপরাধপ্রবণ করে তুললেন। ফলে এ জাতীয় জীবিকা 'ইবাদাত তো নয়ই বরং গুনাহের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। যেমন- শারী'য়াতের সীমারেখার তোয়াক্কা না করে কেউ যদি হারাম পন্থায় উপার্জন করে, এরপর তার এই উপার্জিত অর্থ যদি সে দানও করে দেয়, তথাপি তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে গুনাহগারই হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

---

১৩৯. আল-কোরআন: সূরা আন্‌-নিসা, ৪:১২৫

১৬৭. সহীহ মুসলিম

مَنْ جَمَعَ مَالاً مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ وِزْرُهُ عَلَيْهِ

“যে লোক হারাম মাল সঞ্চয় করল, পরে তা দান করে দিল, সে তার কোন সওয়াব পাবে না। আর তার হারাম উপার্জনের গুনাহ্ তো তার উপর বোঝা হয়ে থাকবেই।”[১৬৮]

এ হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি হারাম সম্পদ দিয়ে দান করার মত ভাল কাজও করে, তথাপি তার সে ভাল কাজ ‘ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। তার সে দান তো গ্রহণ করা হবেই না, উপরন্তু হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জনের পাপও তাকে বহন করতে হবে। উদ্দেশ্য ভাল হওয়ার সুবাদে এ পাপ থেকেও সে রেহাই পাবে না।

পাঁচঃ জীবিকার কাজ যেন তাকে দীনি দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না রাখে। তাকে অবশ্যই দীনি কাজ এবং দুনিয়ার কাজের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। দুনিয়াপূজারী হয়ে যেমন পরকাল বিমুখ হওয়া চলবেনা, তদ্রুপ দুনিয়ার মৌলিক প্রয়োজনের কথা ভুলে থাকলেও হবেনা। তবে দুনিয়ার কাজের চেয়ে পরকালীন কাজ অবশ্যই অগ্রাধিকার যোগ্য। কেননা দুনিয়ার কল্যাণের চেয়ে পরকালের কল্যাণ এবং দুনিয়ার অকল্যাণের চেয়ে পরকালের অকল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবতঃ এহেন গুরুত্বের কারণেই দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা কোরআনুল কারীমের ৪০ টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬৯] তবে এ দু’য়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা অবশ্যই জরুরী। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)

“আর আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে পরকালীন কল্যাণ অন্বেষণ কর। তবে দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য হিস্যার কথা ভুলে যেয়ো না।”[১৭০]

---

[১৬৮] আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ), কিতাবুয যাকাত, খ. ১, পৃ. ৫৪৮

[১৬৯] আল-হিমসী, ড. মুহাম্মাদ হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

[১৭০] আল-কোরআনঃ সূরা আল-কাসাস, ২৮:৭৭

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়ায় আমাদের সুখ সুবিধা অন্বেষণের ব্যাপারে উদাসীন না হতে বলেছেন। তবে এর মাধ্যমে আমাদের মূল টার্গেট যেন হয় পরকালের অনাবিল শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করা। অর্থাৎ পরকালে তিনি আমাদের জন্য যে অফুরন্ত নিয়ামত রেখে দিয়েছেন, তা পাওয়ার জন্য যেন আমরা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করি। আর এটি করতে গিয়ে আমরা যেন দুনিয়ার ন্যূনতম চাহিদাগুলোর কথা ভুলে না যাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

(يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ)

"ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বেভুলা বানিয়ে না ফেলে। যারা এমনটি করে তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।"[১৭১]

মোটকথা, ইসলাম আমাদেরকে একপেশে জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেনা। বরং ইসলাম চায় যে, আমাদের ইহলৌকিক কাজ এবং পারলৌকিক কাজ উভয়ই হোক অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ও উদ্দীপনামুখর। কা'ব বিন আজরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ جِلْدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، لَوْ كَانَ هَذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ؟! (أَيْ فِيْ الْجِهَادِ لإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ ، وَكَانَ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ عِنْدَهُمْ) فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ . وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَ مُفَاخَرَةً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ .

---

[১৭১] আল-কোরআন: সূরা আল-মুনাফিকূন, ৬৩:৯

“জনৈক ব্যাক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কর্মচাঞ্চল্য দেখে অভিভূত হয়ে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ লোকটির উদ্দীপনা যদি আল্লাহর পথে তথা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র কাজে হতো তাহলে কতইনা ভাল হতো! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যদি সে তার ছোট সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য বেরিয়ে থাকে, তাহলে তা আল্লাহর পথে। যদি বৃদ্ধ পিতা মাতার খেদমতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাকে, তাহলেও তা আল্লাহর পথে। এবং যদি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করার জন্য বেরিয়ে থাকে, তাহলে তাও আল্লাহর পথে। আর যদি গর্ব অহংকার প্রদর্শনের জন্য বেরিয়ে থাকে, তাহলে তা শয়তানের পথে।”[১৭২]

তাই দুনিয়ার জীবনে জীবিকা নির্বাহের কাজে যেমনি প্রবল আগ্রহ ও উৎফুল্লতার স্বাক্ষর রাখা হয়, তেমনি স্বাক্ষর রাখতে হবে পরকালীন জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে। দুনিয়ার বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দেয়া শর্ত অনুযায়ী যেমনিভাবে সময়, মেধা ও শ্রম দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে, পাশাপাশি এ তৎপরতা যেন স্রষ্টার দেয়া দৈনন্দিন পালনীয় ফরয আদায়ে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটায় তাও খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া শ্রমনীতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত। ইসলাম তাই নিয়োগকর্তাকেও এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ করে দিয়েছে। অধীনস্থ থেকে কাজ আদায়ের ব্যাপারে তিনি যেমনি সজাগ ভূমিকা রাখবেন, তেমনি আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনেও তিনি যেন তার জন্য বাধ না সাজেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে বাধা দেয়া তো দূরের কথা- অধীনস্থ ব্যক্তির ইসলামী অনুশাসন না মানার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিও করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে একথারই প্রমাণ মিলে। তিনি ইরশাদ করেছেন:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِهِ وَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ

---

[১৭২] আত্-তাবারানী, আল-মু’জামুল কাবীর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৮২

مَال سَيِّدِهِ وَ مَسْـئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْـئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম/নেতা দায়িত্বশীল, আর তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ তার পরিবারের মধ্যে দায়িত্বশীল এবং তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর নারী তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীলা এবং তিনি তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। কর্মচারী তার মনিবের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বশীল এবং সেও তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং সকলেই তার অধীনস্থের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে”। (মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি: বুখারী ২/৩১৭, মুসলিম ১৮২৯)[১৭৩]

শারী‘য়াতের নীতিমালা অনুযায়ী যৌন চাহিদা মেটানোও ‘ইবাদাত:

ইসলামী শারী‘য়াতের এ এক বিরাট মহানুভবতা যে, এখানে ব্যক্তি তার একান্ত নিজস্ব জৈবিক চাহিদা মেটানোর মধ্য দিয়েও স্রষ্টার দাসত্ব আঞ্জাম দিতে পারে। সে তার দৈনন্দিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং নিজের স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের মাধ্যমে যে ব্যক্তিগত জৈবিক চাহিদা মেটায়, তাও তার জন্য ‘ইবাদাত, যদি সে এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়াত করে থাকে। কেননা এ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দাসত্বের জন্য শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ, আর যৌন মিলনের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীর হক্ব আদায় করা, নিজের লজ্জাস্থানের হিফাযত করা এবং সর্বোপরি আল্লাহর যমীনকে আবাদ করা। ‘আল্লামা কারদাবী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

فَالنِّيَّةُ هِيَ الْمَادَّةُ السِّحْرِيَّـةُ الْعَجِيْـبَةُ الَّتِيْ تُضَافُ إِلَى الْمُبَاحَاتِ وَالْعَادَاتِ فَـتَصْنَعُ مِنْهَا طَاعَاتٍ وَقُرُبَاتٍ .

“নিয়াত হলো এক আশ্চর্যময় যাদুকর বস্তু, যা আচরণাদি এবং মুবাহ কার্যাদির সাথে মিলিত হয়ে এগুলোকেও আল্লাহর আনুগত্য এবং সন্তুষ্টিতে পরিণত করে।”[১৭৪]

---

[১৭৩] আন-নববী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শারফ, রিয়াদুস স্যালেহীন (বৈরূত: দারুস সাকাফাহ আল-‘আরাবিয়্যাহ, মু. ১২, ১৪১১ হি.), পৃ. ১৩১, হাদীস নং- ৩০০

[১৭৪] আল-কারদাবী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩

এ প্রসঙ্গে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন:

وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَــةٌ ، قَالُوْا: أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ: أَرَأَيْــتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ قَالُوْا: نَعَمْ ، قَالَ: كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ!! .

"তোমাদের যৌন উপভোগের মধ্যেও রয়েছে পুণ্য। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন: আমরা তো কেবল আমাদের রিপুর তাড়না মিটাই, তাতেও কি আমাদের পুণ্য হবে?! তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যদি তা হারাম পন্থায় মেটানো হত, তাহলে কি এতে পাপ হত? তারা (সাহাবীরা) বললেন: হ্যাঁ অবশ্যই। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধালেন: তাহলে তা হালাল পন্থায় হলে কেন তাতে পুণ্য হবে না !!"[১৭৫]

মানুষের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট বয়সে আল্লাহ তা'আলা নিজেই এই জৈবিক চাহিদা সৃষ্টি করে দেন। তাই এ চাহিদা পূরণের যথাযথ ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন। মানুষ সহ অন্য সকল সৃষ্টিকেই তিনি জোড়ায় জোড়ায় তৈরী করেছেন। এবং তাদেরকে স্বস্ব জৈবিক চাহিদা পূরণের সঠিক পন্থাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর দেয়া পন্থায় এ চাহিদা মেটালে তা হয় তাঁর 'ইবাদাত তথা আনুগত্য বলে গণ্য। এবং এ পন্থায় নিজের ইচ্ছামত কোন ব্যত্যয় ঘটালে তা হয় মা'সিয়াত তথা তাঁর নাফরমানী। এ কারণেই মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়- এমনকি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৈহিক মিলন সংক্রান্ত ব্যাপারাদির ওপরও সুস্পষ্টরূপে আলোকপাত করেছেন।

মু'মিনের গোটা জিন্দেগীটাই বরং 'ইবাদাত:

আমরা এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি বা খালীফা। প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাজ হলো নিজেদের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তবায়ন করা। খালীফা হিসেবে সদা এ কাজে নিয়োজিত থাকার অর্থই হলো আল্লাহর 'ইবাদাত তথা দাসত্ব করা। কেননা কোরআনের ভাষায়

---

১৭৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৩৭৬

‘ইবাদাতই হলো আমাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। ‘ইবাদাতের জন্যেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ)

“জ্বীন এবং মানুষকে আমি কেবল আমার ‘ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।”[১৭৬] আল্লাহর এ আয়াতের যথার্থতা তখনই হবে যখন আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর ‘ইবাদাতে পরিণত করতে সক্ষম হব। আমরা আল্লাহর দাস, আর তিনি আমাদের প্রভু বা মনিব। মনিবের দায়িত্ব হলো কাজ সৃষ্টি করা এবং তা করতে আদেশ দেয়া। আর দাসের দায়িত্ব হলো সে কাজ মনিবের আদেশ মত পালন করা। মনিবের বেলায় যেমন কাজ নির্ধারণ না করে দিয়ে আদেশ করা অর্থহীন। দাসের বেলায়ও তেমন নিজের ইচ্ছেমত কাজ করে মনিবের সন্তুষ্টি আশা করা অর্থহীন। আর তাই আল্লাহ নিজেই আমাদের কাজেরও স্রষ্টা। আল-কোরআন বলছে: (وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ) “আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন।”[১৭৭] অর্থাৎ আমাদের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, আমাদের সকল প্রকার চাহিদার স্রষ্টাও তিনি। আমাদের দেহ ও মনে বিশেষ নিয়মে বিশেষ সময়ে বিশেষ চাহিদা তিনিই সৃষ্টি করেন। এ কারনেই এই সমস্ত প্রকার চাহিদা মেটাবার পন্থা তিনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। যা ইসলামী শারী‘য়াত নামে খ্যাত।

অতএব এই শারী‘য়াত মুতাবিক নিজের সকল চাহিদা মেটালেই তাকে আমরা বলতে পারি ‘ইবাদাত। এবং যদি কেউ এই শারী‘য়াতের মূলনীতিকে বাদ দিয়ে নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে কোন চাহিদা মেটাতে চায়, তাহলে তা আর ‘ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহর নির্দেশিত মৌলিক যেসব কাজ ‘ইবাদাত বলে গণ্য, সেসব কাজের জন্য সহায়ক উপায় উপকরণাদিও তেমনি ‘ইবাদাত হিসেবে গণ্য। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া (রহ.) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ فَهُوَ عِبَادَةٌ .

---

[১৭৬] আল-কোরআন: সূরা আয্-যারিয়াত, ৫১:৫৭

[১৭৭] আল-কোরআন: সূরা আস্-সাফ্ফাত, ৩৭:৯৬

"আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে যেসব উপায় উপকরণাদির ব্যাপারে আদেশ করেছেন, সেগুলোও 'ইবাদাত।"[১৭৮]

অতএব মানব জীবনের কোন একটি মুহূর্তও 'ইবাদাতের গন্ডির বাইরে নয়। আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় নিজের গোটা জিন্দেগীটাই একজন মু'মিনের জন্য 'ইবাদাতে পরিণত হওয়া সম্ভব। আর তাহলেই আল-কোরআনে বর্ণিত মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে সার্থক।

অন্যথায় মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে হয়ঃ

'ইবাদাতের উপরোক্ত ধারণা মেনে না নিলে যে সমস্যাটি দেখা দেয় তা হলো, আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়। কেননা আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী মানুষকে কেবল তাঁর দাসত্ব ছাড়া অন্য কিছুই করার নিমিত্তে সৃষ্টি করা হয়নি। তাহলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ তার সকল প্রকার চাহিদা (শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি) মেটাবার জন্য যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তা সবই আল্লাহর 'ইবাদাতে গণ্য হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্যথায় মানুষের পক্ষে সর্বাবস্থায় তাঁর 'ইবাদাতে মত্ত থাকা সম্ভব হবে না এবং তাকে সৃষ্টি করার মূল লক্ষ্যই হবে ব্যাহত। আর না হয় কালামে পাকের ঘোষণাকে বলতে হবে ভুল (না'উযুবিল্লাহ)।

এমতাবস্থায় এর সঠিক সমাধান একটিই হতে পারে যে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্রান্ত আল্লাহর ঘোষণাই যথার্থ সত্য। আর এটি সত্য বলেই মানুষের উপরোক্ত সকল চাহিদা মেটাবার উপযুক্ত বিধান দিয়ে আল্লাহ মানুষকে এ দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। এবং এ বিধানকে মানুষেরা যেন মানার অনুপযোগী বলতে না পারে সেজন্য তাদেরই ভেতর থেকে তাঁর প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে তিনি তা যুগে যুগে বাস্তবে রূপায়ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত উপরোক্ত বিধানই হলো ইসলামী শারী'য়াত, আর নবী-রাসূলগণের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদর্শিত এর বাস্তবায়নের পন্থারই নাম হলো সুন্নাহ। তাই মহান আল্লাহর বিধানসমূহকে নবী রাসূলগণের দেখানো পন্থায় অনুসরণের মাধ্যমে গোটা জীবনটাকে 'ইবাদাতে পরিণত করতে পারলেই মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সফল হবে। এ দুনিয়ায় মানুষের জন্য যে জীবনোপকরণ রয়েছে, তাতে অন্ধভাবে মগ্ন হয়ে গেলে মানুষ

---

[১৭৮] ইবন তাইমিয়াহ, আহমাদ ইবন 'আব্দিল হালীম, আল-'উবূদিয়্যাহ (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, মু. ৬, ১৪০৭ হি.), পৃ-৭৩

আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডীর বাইরে চলে যায়। এবং ফলশ্রুতিতে সে পরকালীন শাস্তির সম্মুখীন হয়। আর এ জীবনোপকরণগুলোকে আল্লাহর দাসত্বের গণ্ডীতে ফেলে ভোগ করলে তা ইহকাল এবং পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই হবে যথার্থ উপভোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন:

(اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ . سَابِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ)

“তোমরা ভাল করে জেনে রাখ যে, দুনিয়ার এ জীবনটা খেল-তামাশা, মনভোলোনোর (উপকরণ), সাজ-সজ্জা, তোমাদের একে অপরের উপর গর্ব করা এবং ধনে-জনে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উদাহরণ এ রকম- যেমন এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেল, (এর ফলে) যে গাছ-গাছড়া জন্মাল তা চাষীকে খুশী করে দিল। তারপর ঐ ফসল পরিপক্ক হলো এবং তোমরা দেখলে যে, তা হলদে হয়ে গেল। তারপর তা ভূষিতে পরিণত হয়ে গেল। এর বিপরীত হলো আখিরাত- যেখানে রয়েছে (একদিকে) কঠিন আযাব, (অপরদিকে) আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা ছলনাময় জীবিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা দৌড়াও এবং একে অপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে এবং ঐ বেহেশতের দিকে, যার বিশালতা আসমান ও যমীনের মতো। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্যই তা তৈরী রাখা হয়েছে। এটা আল্লাহরই মেহেরবাণী, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান”।[১৭৯]

আল-কোরআনের অন্যত্র মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন:

---

১৭৯. আল-কোরআন: সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২০-২১

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ . فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْكَرِيْمِ . وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ
بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ)

“তোমরা কি এ ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থকই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমাদেরকে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না ? আল্লাহই মহান এবং আসল বাদশাহ্। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই মহান আরশের রব। যে কেউ আল্লাহ্র সাথে আরও কোন মা'বূদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার রবের নিকট আছে। এমন কাফেররা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না” ।[১৮০]

সুতরাং সব মানুষ কেবল আল্লাহকেই ডাকুক, কেবল তাঁরই দাসত্ব করুক- এটাই আল্লাহ্ চান। আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি মানবকূলকে সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হলে তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রয়োগ করবেন।

'ইবাদাত না করার কারণে আল্লাহ্র শাস্তি প্রয়োগের যৌক্তিকতা:

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্রান্ত আল্লাহর ঘোষণা যেহেতু সত্য, যুগে যুগে মানুষদের ভেতর থেকে নবী রাসূল পাঠাবার ঘটনা যেহেতু বাস্তব এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে মানুষ স্বভাবগতভাবেই যেহেতু পার্থক্য করতে পারে, তাই 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে অবাধ্যতার জন্য মানুষকে শাস্তি দেয়াও অত্যন্ত যৌক্তিক। কেননা সৃষ্টির শুরু থেকে আরম্ভ করে যখনই আল্লাহ্ কোন জনপদে মানুষ পাঠিয়েছেন, তখনই তাদেরকে এই 'ইবাদাত সংক্রান্ত নীতিমালা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য একজন নবী কিংবা রাসূল পাঠিয়েছেন। সেসব নবী ও রাসূলকে মৌলিক মানবীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদের ভাষা ও আচরণ বুঝার ক্ষমতা সমকালীন সমস্ত মানুষকে প্রদান করেছেন। তাছাড়া সাধারণভাবে ভাল ও মন্দ চেনার মৌলিক যোগ্যতা তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে প্রদান করেছেন।

অন্য কথায়, এ জগতের কোন মানবকেই আল্লাহ্ কখনো বিধান শূন্য অবস্থায় রাখেননি। আর সম্ভবত: এজন্যেই দুনিয়ার প্রথম মানব যিনি, তিনি ছিলেন একজন নবী। এবং প্রত্যেকেই যেন তার কৃতকর্মের খতিয়ান চাক্ষুস দেখে নিতে পারে সেজন্যে তা লিপিবদ্ধ করারও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। যুগ

---

[১৮০] আল-কোরআন: সূরা আল-মু'মিনূন, ২৩:১১৫-১১৭

যুগ ধরে আল্লাহর বিধানের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলে আসছে বলেই মানুষদেরকে এ বিধান না মেনে চলার কারণে আল্লাহ্ শাস্তি প্রদান করবেন। বিধান না পাঠিয়ে তিনি কাউকে কখনো শাস্তির মুখোমুখি করবেন না। এবং একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকেও পাকড়াও করবেন না। এ বিষয়ে আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা কোরআনুল কারীমে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

(وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِيْ عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا . اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْباً. مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً)

“আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামাতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। যে কেউ সৎপথে চলে, সে নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। আর কোন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি শাস্তি প্রদান করি না।”[১৮১]

তাছাড়া মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বিষয়েও আল্লাহ্ তাকে বাধ্য করেন না। এ ব্যাপারে আল-কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো:

(لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

“আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না। সে ভাল যা করেছে তার সুফল সেই পাবে, আর যা মন্দ করেছে তার বোঝাও তারই উপর চাপবে।”[১৮২]

অতএব মানব জাতিকে বিবেক বুদ্ধি সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করার পাশাপাশি যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে এবং এই বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান ও এর বাস্তব অনুশীলন শেখাবার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলগণকে

---

১৮১. আল-কোরআন: সূরা আল-ইসরা, ১৭:১৩-১৫
১৮২. আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:২৮৬

পাঠানো হয়েছে, তাই 'ইবাদাত না করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রদান যথাযথ যৌক্তিক।

'আল-কোরআনের মানদন্ডে 'ইবাদাতের এই সর্বজনীনতার বিশ্লেষণঃ

আমাদের সমাজে আজও অনেকে মনে করেন যে, 'ইবাদাত হলো সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ ...... ইত্যাদি কতক সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সর্বস্ব কাজের নাম। এটা মনে করার কারণেই তারা এসব আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত জ্ঞানের জন্য 'আলিম সমাজের কাছে দৌড়ান। অথবা এই সংক্রান্ত বই পুস্তক অধ্যয়নের চেষ্টা করেন। অথচ জীবনের আরো অনেক ব্যাপার আছে, যা জানার জন্য তারা কখনো কোরআন-সুন্নাহ কিংবা ইসলামী বই পড়তে আগ্রহী হন না। কিংবা কোন 'আলিমের কাছ থেকেও তা জানার চেষ্টা করেন না।

কোরআন সুন্নাহ সংক্রান্ত যৎসামান্য লেখাপড়ায় আমি যা পেয়েছি তা হলো- এইসব আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাত গুলো নিয়ে কোরআনের সর্বোচ্চ ৫০-৬০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। অথচ এই কোরআন ৬০০ (ছয়শত) পৃষ্ঠারও কিছু বেশি। প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাহলে অবশিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোতে কি রয়েছে? এগুলোর সবই কি পূর্বেকার উম্মাতদের কাহিনী? তবে এটা ঠিক যে, কোরআনে আগেকার নবী-রাসূল এবং তাঁদের উম্মাতদের বেশ কিছু ঘটনা এমনকি কোন কোন নবীর অনেক লম্বা ঘটনাও আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তা নিছক ঘটনা বলার জন্য ঘটনা নয়, বরং তা থেকে এই উম্মাতকে আল্লাহ তা'আলা অনেক কিছু শেখাতে চান। এমনকি পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টান্ত দিয়েও মহান আল্লাহ আমাদেরকে শেখাতে চেয়েছেন। এসব ঘটনা, কাহিনী এবং দৃষ্টান্তের জন্য আরো দুই একশ পৃষ্ঠা যদি আমরা বাদও দেই, তারপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআনের বাকী পৃষ্ঠাগুলোতে কি রয়েছে?

প্রকৃতপক্ষে সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ ইত্যাদি ছাড়াও ইসলামের আরো অনেক মৌলিক বিধান রয়েছে এই কোরআনে, যার ব্যাপারে আমরা উদাসীনতা প্রদর্শন করছি। আমাদের মাঝে অনেকে হয়ত প্রতিদিন কোরআনের একটা বিরাট অংশ তিলাওয়াত করতেও অভ্যস্ত। কিন্তু তিলাওয়াতকৃত সে অংশে মহান স্রষ্টা আমাদেরকে কী কী নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা জানার সামান্যতম চেষ্টাও আমরা করি না। অথচ ইসলামের বিধানগুলো জানার জন্য এখন আর বহু দূর সফর করে যেতে হয় না। আল-কোরআন, আস্-সুন্নাহ এবং ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর উপর রচিত গ্রন্থাদি এখন যে কোন ভাষায় আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাছাড়া ইসলামের উপর বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রন্থ

তো আছেই। এমনকি আল-কোরআনের বিধি-বিধানের পাঁচশত আয়াতের উপর আলাদা পুস্তকও প্রণীত হয়েছে বহু আগে। এরপরও কি আমরা 'ইবাদাত সংক্রান্ত এরূপ সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে পারব না ? অথচ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নিজেই অত্যন্ত স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন যে -

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এ কিতাবে কোন কিছুই বলতে ছাড়িনি।"[১৮৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি সকল কিছুর বিস্তারিত বর্ণনা সহকারে।"[১৮৪] তাছাড়া আল-কোরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

(هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانُ)

"এটি মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশিকা । আর সেই পথ নির্দেশিকা অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বিবৃত এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম।"[১৮৫]

তাই কোরআন সুন্নাহয় বর্ণিত বিধানের আলোকে মানব জীবনের সকল কর্মকান্ডই 'ইবাদাত বলে গণ্য। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই 'ইবাদাত পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে একই সাথে আল্লাহর হুকুম যথাযথরূপে প্রতিপালনের নামই 'ইবাদাত। অন্য কথায়, মানবকুল, প্রাণীকুল, প্রকৃতি ও পরিবেশ তথা সকল সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর হুকুম মুতাবিক আচরণ করার নামই 'ইবাদাত।

উপসংহারঃ

ইহজগতে আমাদের সৃষ্টিই হয়েছে মহান আল্লাহর দাসত্ব তথা 'ইবাদাতের জন্য। একজন মানুষ যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব করতে পারে, সেজন্যেই যুগে যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত বিধানাবলী সহ নবী-রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছে। জীবনের কোন স্তরে কখনো যদি আল্লাহর দাসত্ব করা অসম্ভব হতো, তাহলে তা তিনি মানুষের জন্য অবধারিত করতেন না। কেননা তিনি মানুষকে তাদের সাধ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তাছাড়া পথনির্দেশনা না দিয়ে কিংবা ভীতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা না করে তিনি কাউকে শাস্তি ও দেন না। মানুষেরা তাদের কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, চাকরী-

---

[১৮৩] আল-কোরআনঃ সূরা আল-আন'আম, ৬:৩৮

[১৮৪] আল-কোরআনঃ সূরা আন্-নাহল, ১৬:৮৯

[১৮৫] আল-কোরআনঃ সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৫

বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদিতে আল্লাহর বিধান মেনে চলুক- এটাই তিনি চান। তাই নিজের জীবনের সকল কিছুকে আল্লাহর ওয়াস্তে নিবেদিত করার ঘোষণা দিতে তিনি তাঁর নবীকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ)

“বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু (সবই) উভয় জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর কোন শরীক নেই। আর এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্বপ্রথম (আত্মসমর্পণকারী) মুসলিম।”[১৮৬]

আল-কোরআনের পুরোটাই হলো আমাদের জন্য পথ নির্দেশিকা। এবং এতে আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান নিহিত রয়েছে। তাই এর কিছু অংশকে বাদ দিয়ে অপর কিছু অংশের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী চলাই যথেষ্ট নয়। বরং এর কিছু অংশকে মানলে আর অবশিষ্ট অংশকে না মানলে আমরা দুনিয়ার জীবনেও শান্তি লাভের আশা করতে পারি না, আর পরকালীন মুক্তির তো কল্পনাই করা যায়না। এ ব্যাপারে আল-কোরআনও আমাদেরকে তাই বলছে। ইরশাদ হয়েছে:

(أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ)

“তবে কি তোমরা কিতাবের (কোরআনের) কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।”[১৮৭]

---

[১৮৬] আল-কোরআন: সূরা আল-আন'আম, ৬:১৬২-১৬৩

[১৮৭] আল-কোরআন: সূরা আল-বাকারাহ, ২:৮৫

পরিশেষে আবূ 'আব্দুর রহমান আস্-সুলামীর একটি বর্ণনা দিয়ে এ প্রসঙ্গটির যবনিকা টানতে চাই। তিনি বলেছেন যে, 'উসমান ইবন 'আফ্ফান (রা) এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী বলেন যে-

كُنَّا نَتَعَلَّمُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْعَشْرَ، فَلاَ نَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْعَشْرِ الْآخَرِ، حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيْهَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ .

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যদি (কোরআনের) দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, তাহলে এই দশটি আয়াতকে অতিক্রম করে অন্য দশটিতে যেতাম না, যতক্ষণ না এ আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী উপলব্ধি করে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে নিতাম।"[১৮৮]

অথচ আমাদের অবস্থা হলো এই যে, আমরাও দৈনন্দিন কোরআন তিলাওয়াত করি, কিন্তু তিলাওয়াতকৃত সে অংশে কি বলা হয়েছে তা বুঝার জন্য আমাদের কোন চেষ্টা নেই, অথবা যা বুঝেছি তা আমল করার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে তেমন কোন পেরেশানি নেই। আল-কোরআনের ব্যাপারে আমরা যদি এরূপ দ্বৈত নীতি (double standard) পরিহার করতে পারি, তবেই আমাদের পক্ষে 'ইবাদাতের ব্যাপক মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব। আর 'ইবাদাতের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারলেই আমাদের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগাবে। ইহলৌকিক কল্যাণের ফলগুধারা বয়ে চলবে সর্বত্র। আর পারলৌকিক মুক্তির আভাসে প্রশান্ত হবে আমাদের মন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে 'ইবাদাতের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে 'ইবাদাতে পরিণত করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

وَصَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنِ اتَّبَعَ
هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

---

[১৮৮] আস্-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কোরআন (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, মু. ১, ১৪০৭ হি.), খ. ২, পৃ. ১৭৬

গ্রন্থপঞ্জী:

এ পুস্তিকা রচনায় যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং আরো যেসব গ্রন্থ থেকে আমি উপকৃত হয়েছি সেগুলোর একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। এগুলোর মধ্যে যেসব গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনা পাদটিকায় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর এখানে শুধু নাম দেয়া হলো। মহান আল্লাহ এ সকল ইমাম, ‘আলিম ও বিজ্ঞজনদের তাঁর অফুরন্ত নি‘আমত, রহমত, মাগফিরাত ও মর্যাদা প্রদান করুন এবং এ গ্রন্থকে তাদের জন্যেও সাদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন।

১. আল-কোরআনুল কারীম
২. আল-বুখারী, আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ, সহীহুল বুখারী
৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম
৪. আত্-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা, আল জামি’ লিত্-তিরমিযী
৫. আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ‘আস, সুনান আবী দাউদ
৬. আন্-নাসায়ী, ‘আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু‘আইব, সুনান আন্-নাসায়ী
৭. আল-বাইহাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন, সুনান আল-বাইহাকী আল-কুবরা
৮. আল-বাইহাকী, আবূ বকর আহমাদ ইবনুল হুসাইন, শু‘আবুল ঈমান
৯. আদ্-দারিমী, আবূ মুহাম্মদ ‘আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্দুর রহমান, সুনান আদ্-দারিমী
১০. মালিক ইবন আনাস, মুয়াত্তা ইমাম মালিক
১১. আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ ইবন হাম্বল
১২. আল-হাকিম, আবূ ‘আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দিল্লাহ, আল-মুসতাদরাক ‘আলা আস্-সাহীহাইন
১৩. ইবন হিব্বান, সহীহ ইবন হিব্বান
১৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী, সুনান ইবন মাজাহ
১৫. ‘আলী ইবন ‘উমার আবুল হাসান আদ্-দারা কুতনী, সুনান আদ্-দারা কুতনী
১৬. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, সাহীহু ওয়া দা’য়ীফু ইবন মাজাহ
১৭. আল-আলবানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন, হাজ্জাতুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামা রাওয়াহা ‘আনহু জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (বৈরূতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১৩৯৯ হি.)
১৮. আত-তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমাদ, আল-মু’জাম আল-কাবীর (আল-মুসিলঃ মাকতাবাতুল ‘উলূমি ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি.)
১৯. আন্-নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবন শারফ, রিয়াদুস সালেহীন
২০. মুহাম্মদ ফুয়াদ ‘আব্দুল বাকী, আল-মু’জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীসিন্- নাবাবী
২১. মুহাম্মদ ফুয়াদ ‘আব্দুল বাকী, আল-লু’লু’ ওয়াল মারজান ফীমাত্তাফাকা ‘আলাইহি আশ্-শাইখান
২২. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম
২৩. আত্-তাবারী, আবূ জা’ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর, জামি’উল বায়ান ‘আন তা’বীলি আইল কোরআন

২৪. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, আল জামি' লিআহকামিল কোরআন

২৫. আস্-সুয়ূতী, জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কোরআন

২৬. শাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া (রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ১৯৯১ খৃ.)

২৭. শাইখুল ইসলাম, আহমাদ ইবন তাইমিয়াহ, আল-'উবূদিয়্যাহ (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ)

২৮. মুনীর মুহাম্মদ গাদবান, ফিক্‌হুস সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যাহ

২৯. মুহাম্মদ হামিদ আন্-নাসির, বিদা'উল ই'তিকাদি ওয়া আখতারুহা 'আলাল মুজতামি'আতিল মু'আসিরাহ, সৌদি আরব, ১৯৯৫

৩০. আর-রাযী, ফখরুদ্দীন, আত-তাফসীরুল কাবীর

৩১. আশ্-শাওকানী, মুহাম্মদ ইবন 'আলী, নাইলুল আওতার (দামেস্কঃ দারুল ফিকর, ১৯৮০ খৃ.)

৩২. মুহাম্মদ ইবন জামীল যাইনূ, আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ওয়া আল-আকীদাহ আল-ইসলামিয়্যাহ

৩৩. ইবন ফাউযান, দুরুসুন ফিল 'আকীদাতিল ইসলামিয়্যাহ

৩৪. 'আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ আল-'আজলান, আখতাউন ফিল-'আকীদাহ

৩৫. হাফিয ইবন রজব, আল-ইরশাদু ইলা সাহীহিল ই'তিকাদ

৩৬. আল-'আসকালানী, ইবন হাজার, ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী

৩৭. 'আব্দুল 'আযীয ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন বায, উজুবু লুযূমিস্-সুন্নাহ ওয়াল হাযারি মিনাল বিদ'আহ

৩৮. আল-হাইসামী, ইবন হাজার, আয্-যাওয়াজির 'আন ইকতিরাফিল কাবাইর বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ১৪২০ হি.)

৩৯. আল-জাযায়িরী, 'আব্দুর রহমান, আল-ফিক্‌হু 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হি.)

৪০. আল-কুরতুবী, ইবন রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ (বৈরূতঃ দারুল কুতুব, ১০ম সংস্করণ, ১৯৮৮ খৃ.)

৪১. আল-জাযায়িরী, আবূ বকর জাবির, মিনহাজুল মুসলিম

৪২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, মুখতাসারু সহীহি মুসলিম

৪৩. আল-হাম্বলী, 'আব্দুর রহমান ইবন রজব, জামি'উল 'উলূমি ওয়াল হিকাম (বৈরূতঃ আল-মাকতাবাহ আল-'আসরিয়্যাহ)

৪৪. শাতিবী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই'তিসাম (বৈরূতঃ দার আল-মা'রিফাহ)

৪৫. ড. মুহাম্মদ সাঈদ রামাদান আল-বূতী, ফিক্‌হুস সীরাহ আন্-নাবাবিয়্যাহ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর আল-মু'আসির, মু. ১১, ১৪১২ হি.)

৪৬. মোল্লা 'আলী আল-কারী, আল-মিরকাতুল মাফাতীহ (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩০৯ হি.)

৪৭. আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল-'ইবাদাহ ফিল ইসলাম

৪৮. আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল-ঈমানু ওয়াল হায়াতু (কায়রোঃ মাকতাবাতু উহবাহ, মু. ৬, ১৩৯৮ হি.)

www.pathagar.com

৪৯. আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম

৫০. আল-কারাদাবী, ড. ইউসুফ, ফিক্‌হুয যাকাত (বৈরূতঃ মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, মু. ২২, ১৪১৪ হি.)

৫১. সুলাইমান ইবন 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল ওয়াহ্‌হাব, তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ

৫২. ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম, হাদীস নিয়ে বিভ্রান্তি (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খৃ)

৫৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাসূলুল্লাহ (সা) এর পোশাক ও পোশাকের ইসলামী বিধান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮)

৫৪. ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া, বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০ খৃ.)

৫৫. মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন খাকী, ইসলামের বাসস্থানে শির্‌ক ও বিদ'আতের অবস্থান, চট্টগ্রাম, ২০০৪

৫৬. ড. মুহাম্মদ 'আলী আল-খাওলী, মু'জামুল আলফায আল-ইসলামিয়্যাহ

৫৭. ড. মুহাম্মদ হাসান আল-হিমসী, কোরআনুন কারীম তাফসীর ওয়া বায়ান মা'আ আসবাবিন নুযূল লিস্‌-সুয়ূতী মা'আ ফাহারিস কামিলাহ্‌ লিল-মাওয়াদি' ওয়াল আলফায

৫৮. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহ্‌রাস লিআলফাযিল কোরআনিল কারীম (কায়রোঃ দারুল হাদীস, মু. ২, ১৪০৮ হি.)

৫৯. আল-মুনজিদ ফিল্‌-লুগাতি ওয়াল আ'লাম, (লেবাননঃ বৈরূত, দার আল-মাশরিক, ১৯৮৬ ইং)

৬০. HANS WRHR, A Dictionary of Modern Written Arabic

৬১. Munir Baalabakki, AL-MAWRID DICTIONARY

ইবাদাত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set